

স্বস্তিকা

দাম : ৭০ টাকা

পূজাসংখ্যা ১৪৩৩, ৫ অক্টোবর, ২০২৬



স্বস্তিকা

॥ বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক ॥

পূজাসংখ্যা

৭৯ বর্ষ ৫ সংখ্যা, ১৭ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

৫ অক্টোবর - ২০২৬, যুগান্দ - ৫১২৮,

Website : www.eswastika.com



সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশচন্দ্র মণ্ডল

রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ৭০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক

সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬

থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট,

কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

সূচিপত্র

দেবী মাহাত্ম্য

মহিষাসুর বধের তত্ত্বকথা ■ স্বামী জ্ঞানপ্রকাশানন্দ ■ ১৯

উপন্যাস

বাঙ্গলার গ্রামে একটি দিন ■ এষা দে ■ ৪০

মহাবীর শ্রীহনুমান ■ গোপাল চক্রবর্তী ■ ৬৯

দাশপাড়ার এক সাবিত্রী ■ গিরিধারী ধর ■ ১১৪

স্বাহা ■ প্রবাল ■ ১৩২

বনবহি — রানি শিরোমণি ■ নন্দলাল ভট্টাচার্য ■ ২০১

গল্প

শকুন্তলা ■ মৌ চৌধুরী ■ ১০৭

ইংলিশ জেঠু — ১৯৭১ ■ অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় ■ ১৮৫

ছোট গল্প

সাম্প্রতিক ■ দেবদাস কুণ্ডু ■ ২২৯

মৃত্যুর প্যাকেট ■ অভিজিৎ দাশগুপ্ত ■ ২৪১

মানবজমিন ■ গার্গী দেব ■ ২৫৪

প্রবন্ধ

ভারতাত্মা থেকে ভারতমাতা ■ কিঙ্কর সামানন্দ ■ ২১

অসুরনাশিনীর অষ্টশক্তি ■ নিখিল চিত্রকর ■ ৩৩

বাঙালির পুতুল যেন এক মাঠ সরলতা ■ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ■ ২১

রবীন্দ্রনাথের উপনিষদ চেতনা— মানবমুক্তির এক মহাকাব্য

■ ড. আশিস গিরি ■ ১০৩

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কমিউনিস্টদের ন্যাকারজনক ভূমিকা

■ ড. অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় ■ ১৯৫

দ্রোহকাল (২০২৩-২০২৬) ■ সুজিত রায় ■ ২২১

সঙ্ঘ মানে সাধনা ■ বিজয় আঢ্য ■ ২৩৫

রবীন্দ্রনাথ ও শ্যামাপ্রসাদ— বিশ্ববিদ্যায়ের অঙ্গনে ভিন্ন ধারার

অনুরণন ■ ড. পঙ্কজ কুমার রায় ■ ২৫০

ভ্রমণ

ভিয়েতনাম দেখে এলাম ■ ডা: মধুসূদন পাল ■ ১৭৯

চলচ্চিত্র

বলয়গ্রাসে রাজেন তরফদার ■ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ■ ২৪৫



মহিষাসুর বধের তত্ত্বকথা

স্বামী জ্ঞানপ্রকাশানন্দ

পৌরাণিক উপাখ্যানে দেখা যায়—দেবী দুর্গা মহিষাসুরকে যুদ্ধে পরাজিত করেছেন। এখন এই মহিষাসুরের পরিচয় সম্বন্ধে আমাদের জানা নেই। প্রকৃতপক্ষে মহিষ হলো একপ্রকার পশুর নাম। আর অসুর কথার অর্থ সুর-বিরোধী। যে দেবদেবী কিছুই মানে না। শক্তি আছে কিন্তু তা অসৎ পথে পরিচালিত। পুরাণে রম্ভাসুরের পুত্র; সে ঘোরতর বলীযান এক অসুর। যে যুদ্ধক্ষেত্রে মায়াজাল বিস্তার করে বিভিন্নরকম ভয়ঙ্কর রূপ ধরে দেবী দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। বিভিন্ন রূপের মধ্যে তিনি মহিষের রূপধারণ করে দেবীকে আক্রমণ করেছিল। একাধারেই মহিষ ও অসুর। তাই এর নাম মহিষাসুর। একাধারেই পশুর গুণাবলী আর অসুরের গুণাবলী বিদ্যমান। পশুর গুণাবলী হলো আহা, নিদ্রা আর মৈথুন। অপর দিকে অসুরের গুণাবলী, গীতায় আছে—দন্তো দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ। অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ (১৬/৪)

অর্থাৎ যারা আসুরী অবস্থান লাভ করেছে তাদের মধ্যে দেখা যায়— ধর্মধ্বংস, ধন ও স্বজননিমিত্ত দর্প, অহঙ্কার, ক্রোধ, কর্কশ ব্যবহার, কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে অব্যবস্থা। আসুরিক ও পাশবিক এই দুটি ভাব-শক্তিতে বলীযান মহিষাসুর। সে দেবী দুর্গাকে বিভিন্ন মায়াজালে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে দশদিক থেকে আক্রমণ করেছিল। তাই দেবীদুর্গাও দশ হাতে যুদ্ধ করে দুর্দমনীয় মহিষাসুরকে পরাজিত করেন।

উপরোক্ত উপাখ্যানটি গভীরভাবে অনুধাবন করলে দেখা যায় দেবতাদের ও অসুরের মধ্যে সংগ্রাম চিরকালের। যেন সু ও কু'র মধ্যে লড়াই।

মানবের অন্তরেও দৈবশক্তির সঙ্গে আসুরিক শক্তির লড়াই সর্বদাই লেগে আছে। প্রতিটি মানবের মধ্যে এই মহিষাসুরের গুণাবলী বিদ্যমান। মানব মন তিনটি গুণে গুণায়িত। তমোগুণ, রজোগুণ ও সত্ত্বগুণ। দেখা যায় তমোগুণের অধিকারী মানবের মধ্যে পাশবিকতা অর্থাৎ পশুর ভাবগুলো বেশি বিদ্যমান—আহা, নিদ্রা, মৈথুন এদের সর্বস্ব। আবার রাজোগুণ প্রধান মানুষে দেখা যায় তারা কর্মের প্রতি আসক্ত। কিন্তু সে কর্ম নিষ্কাম নয় সাকামকর্ম। যা মানবকে মুক্তির পরিবর্তে বন্ধনের কারণ হয়। আমরা এটি অসুরের মধ্যে দেখতে পাই।

আর সত্ত্বগুণের অধিকারীর মধ্যে দেখা যায় দৈবীশক্তি বা সৎগুণাবলী। গীতায় ষোড়শ অধ্যায়ে দেবী সম্পদের কথা বলা হয়েছে—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।

দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ অর্জবম্॥ (১৬/১)

অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।

দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্তং মর্দবং হ্রীরাচাপলম্॥ (১৬/২)

তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।

ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥ (১৬/৩)

অর্থাৎ যাঁরা দৈবী সম্পদলাভ করেছে তাঁদের ভয়শূন্যতা, ব্যবহারকালে পরবর্ধন ও মিথ্যাকথন-বর্জন, জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা, সামর্থ্যানুসারে দান, বাহ্যিক্রিয়ের সংযম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, শান্তি, পরদোষ প্রকাশ না করা, দীনে দয়া, লোভরাহিত্য, মৃদুতা, অসৎ চিন্তা ও অসৎ কর্মে লজ্জা, অচপলতা, তেজ, ধৈর্য, বাহ্যভ্যন্তর শৌচ, অবৈরাভাব, অনভিমান, ক্ষমা, পরোপকার, নিরহংকারিতা ও ঈশ্বর প্রণিধান। এগুলি হলো দৈব শক্তি।

মানব মনে আসুরিক ভাবগুলো এবং পাশবিক ভাবগুলো প্রবল থাকায় দৈবীভাবগুলো যা সত্ত্বগুণজাত তা প্রকাশিত হতে পারে না। কিন্তু সাধনার মাধ্যমে আসুরিক, পাশবিক ভাবগুলো দূরীভূত করতে পারলে দৈবভাবগুলোর স্ফুরণ ঘটে। তখনই মানুষ প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হয়। সে ভগবান লাভের যোগ্য হয়ে মানব জীবন সার্থক করে।

দুর্গাপূজার কাঠামোতে দেখা যায়, দেবী দুর্গার পদতলে মহিষাসুরের অবস্থান। যুদ্ধের পূর্বে অসুরের ধারণা ছিল দেবী দুর্গা সামান্য অবলা নারী যা কিনা পুরুষের ভোগের বস্তু। কিন্তু মহিষাসুর পরাজিত হয়ে উপলব্ধি করেছে—দেবী দুর্গা নারী হলেও ভোগের বস্তু নয়। দেবী দুর্গার ত্রিশূল তার বক্ষে বিদীর্ণ হলে মহিষাসুরের মধ্যে আসুরিক ও পাশবিক ভাব ত্রিশূলের দ্বারা বিনষ্ট হওয়ায় তার মধ্যে দৈবীভাবগুলো জেগে উঠেছে। তাই দেবী দুর্গাকে সে জগজ্জননী সম্বোধন করে স্তব শুরু করে।

মূলত একই মায়ের দু'টি সন্তান একটি দেবতা, অন্যটি অসুর। মহিষাসুরের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী দুর্গা অসুরকেও নিজ সন্তান জ্ঞান করে তাঁরই পদতলে স্থান দিয়েছেন।

শ্রীমা সারদা দেবী বলতেন, সন্তানের যদি ধুলো কাদা গায়ে লাগে তাতো মা-ই সে ধুলো ঝেড়ে, কোলে তুলে নেয়। ফলে মহিষাসুর এখন আর অসুর নয়। দেবতার আসনে স্থান লাভ করে ভক্তের নিকট পূজনীয় হলো।

মানবের মধ্যেও তমোগুণজাত, রজোগুণজাত, পাশবিক আসুরিক ভাবগুলো বিদ্যমান। এগুলো সাধনার মাধ্যমে মানুষ দূর করতে পারলে যোগ্যতা অর্জন করে দেবতার আসনে উন্নীত হতে পারে। যে যত সৎচিন্তা, সৎধ্যান, সৎকাজ করবে ততই তার ভেতর থেকে অসৎভাবনা তিরোহিত হবে।

অর্থাৎ আসুরিক ভাব দূর হবে দৈবীভাব প্রবল হবে। তখন কাম-ক্রোধাদি হ্রাস পেয়ে তার মধ্যে জাগ্রত হবে জীবের প্রতি ভালবাসা, প্রেম, ক্ষমা, দয়া, পরোপকার, অহিংসা। প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি, আনন্দ। যা মানবের কাম্য। ফলে আসুরিক ও পাশবিক সম্পন্ন ব্যক্তিও ক্রমে সৎ মানুষে পরিণত হতে পারে। সমাজের নিকট গ্রহণীয়, আদরণীয়, স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারে। মহিষাসুর বধে দেবীদুর্গা যুদ্ধক্ষেত্রে মহিষকে ও অসুরকে বধ করেন ত্রিশূলরূপ অস্ত্র দিয়ে। মহিষাসুরের এই ভাব দু'টি মানব মনেও রয়েছে।

প্রকৃত পক্ষে অজ্ঞানীরাই নিম্ন স্তরের প্রাণী। তাদের মধ্যে পাশবিক ও আসুরিক ভাবই প্রধান। আর তা দূর করতে দেবী প্রয়োগ করলেন জ্ঞানরূপ ত্রিশূলকে। কারণ প্রকৃত জ্ঞান হলে কু-ভাবগুলো দূর হয়ে সু-ভাবে পূর্ণ হয়। অজ্ঞানরূপ ভাবগুলো দূর হয়। সিংহের পিঠে এবং অসুরের দেহে দু'পা সজোরে চেপে রেখে যুদ্ধ করেছেন অসুরের সঙ্গে। মানব মনের পাশবিকতা ও আসুরিকতা দূর করতেও তদ্রূপ শক্তভাবে মানসিকতা বা পুরুষকার নিয়ে কু-ভাবগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করে সংভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এরূপে মানব মনেও দৈবী শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে মানুষ দেবভাবাপন্ন হতে পারে। দেবী দুর্গার আরেক নাম—‘ত্রিনয়নী’। তাঁর তিনটি নয়ন নেই, তবে সাধনার মাধ্যমে তা লাভ করা যায়। তৃতীয় নয়ন দ্বারা আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ হয়। দেবী দুর্গা তাঁর তৃতীয় নয়ন থেকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করে জীবের অজ্ঞানরূপ আসুরিকতা দূর করেন।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন—হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে দেশলাই জ্বালালে মুহূর্তেই সব অন্ধকার দূর হয়ে যায়। তদ্রূপ আমাদের মনের অজ্ঞানতাও দেবী দুর্গার কৃপায় তাঁর পূজা করে, ধ্যান করে, মনের মলিনতা দূর করে, শুদ্ধতায় ভরে উঠে পূর্ণাঙ্গ মানবে পরিণত হতে পারি। সমাজের অসুর শ্রেণীর মানবের পরিবর্তন হয়ে সব দেবমানব হবে, সমাজ হবে সত্যযুগের। বিশ্ব হবে আনন্দময়।

(লেখকঃ অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ আশ্রম ও মিশন, যশোর)



ভারতাত্মা থেকে ভারতমাতা

কিষ্কর সামানন্দ

‘বন্দে মাতরম্’ ভারতবর্ষের তথা আপামর ভারতবাসীর জীবন ইতিহাসের এক অনন্য উন্মোচন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত এই ভারতমাতার বন্দনা শুধুমাত্র একটি দেশাত্মবোধক সঙ্গীত নয়; ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক অনন্য অঙ্গ। দার্শনিক দৃষ্টিতে এবং আধ্যাত্মিক অনুভবে মাতৃভূমি তথা চিন্ময়ী দেশমাতৃকার প্রতি আত্মনিবেদন ও আত্মবলিদানের এক অনবদ্য উচ্চারণ। এই সঙ্গীত সাহিত্য, দর্শন, সংস্কৃতি এবং জাতির চৈতন্যগত প্রেরণাকে

এক অবিচ্ছিন্ন সূত্রে আজও বেঁধে রেখেছে। ভারতবাসীর মননে প্রেরণার মূলমন্ত্র এই সঙ্গীতে ভারতমাতা কোনো ভৌগোলিক সীমানায় সীমায়িত হননি। তিনি শক্তি, জ্ঞান, সমৃদ্ধি, করুণা ও সৌন্দর্যের জীবন্ত প্রতিমূর্তিরূপে জগদ্বাসীর স্মরণে, মননে সর্বদা অনুরণিত হয়েছেন। এই মাতৃভাব শুধুই আবেগপ্রসূত নয়; মানবসুলভ দৃঢ় ও পূর্ণ অনুভব, কৃতজ্ঞতা, শ্রদ্ধা ও সত্যের প্রতি নত-নম্রতার উপাদানে প্রকাশিত। বেদ, উপনিষদ, তন্ত্র, পুরাণ সর্বত্রই মা শক্তিরূপে প্রতীয়মান হয়েছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলেছেন, মাতৃদেবো ভব^১, অর্থাৎ মা দেবতুল্য মর্যাদায় সর্বদা অধিষ্ঠিতা। মায়ের মধ্যেই ঈশ্বরীয় স্নেহ, ত্যাগ ও করুণার একত্র মেলবন্ধন ঘটেছে। এই মাতৃতত্ত্বই মাটিরূপ, অধিষ্ঠানরূপ, আশ্রয়রূপের মধ্যেও নিহিত হয়ে আছে। যে ভূমি আমাদের জীবন, অন্ন, জল, বাসস্থান, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয় প্রদান করেন, তিনি ভারতীয় চিন্তনে ও মননে মায়ের মর্যাদায় অভিষিক্ত হন।

ভারতীয় পরম্পরায় শাক্তধারা, উপনিষদীয় চিন্তনে, পৌরাণিক তত্ত্বের অন্তর্নিহিত আদর্শে উদ্ভাসিত হয়ে আছে এই ‘বন্দে মাতরম্’ রূপ মাতৃবন্দনা। এই সঙ্গীতের দার্শনিক ব্যাখ্যা এমন এক অভিনবত্ব উন্মোচন করে, যেখানে নৈতিকতা, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক আদর্শ যে একত্র সমাবিষ্ট হয়ে আছে সেটা বোঝা যায়।

দেবীরূপে সুশোভিতা চিন্ময়ী ভারতমাতা

সঙ্গীতে অন্তর্নিহিত গভীর তত্ত্বসমূহ ভারতীয় জাতীয়তাবোধের, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক অভিনব উন্মোচন। এবং এর শিকড় প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে প্রোথিত। আমরা লক্ষ্য করি ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের চেতনায় উদ্ভাসিত মাতৃভূমি ও বৈদিক ঋষিদের বীক্ষণে প্রকাশিত মাতৃমূর্তির মধ্যে গভীর সাযুজ্য রয়েছে। বৈদিক সাহিত্যে মা হলেন—পৃথিবী, প্রকৃতি, ভূমি, দেবী এবং আরও অনেক কিছু। তাই ঋষির দৃষ্টিতে ভারতভূমি দেবীরূপে বন্দি। দেবী শব্দটি বৈয়াকরণের মতে, দিব্ ধাতুর উত্তর অচ্ + ঈপ্ এইরূপে নিষ্পন্ন হয়েছে। এই দিব্ ধাতুটি পাঁচটি অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ১. দুতি, ২. স্তুতি, ৩. মোদ, ৪. ক্রীড়া, ৫. গতি। যখন অব্যক্ত আদ্যাশক্তি স্থূল বা সূক্ষ্মরূপে প্রকাশিত হন, তখন দিব্ ধাতুর অর্থ দুতি বা আলোকচ্ছটা বলে বুঝতে হবে। যখন মুক্তির জন্য এবং কাম্য বিষয় প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে স্তুতিযোগ্যরূপে ধরা দেন তখন তিনি ‘দেবী’। আবার যখন আনন্দময়ী শক্তিরূপে প্রতিভাত হন তখন ‘মোদ’ অর্থ গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। জ্ঞানময়ী চিৎশক্তি। আর দিব্ ধাতুর অর্থ হলো ‘দ্যুতি’।

এই মাকে যখন সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী লীলাময়ী শক্তি বলে জানব তখন অর্থ হবে ‘ক্রীড়া’। প্রেরিকা শক্তি বলে স্বীকার করলে অর্থ হবে—গমন অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি গমন, অথবা বিষয়ের প্রতি প্রেরিকা শক্তি হবেন দেবী। এই দেবীশক্তিই হলেন ভারতমাতা। যিনি মূন্ময়ী ভূখণ্ডের অন্তরালে চিন্ময়ী পরাশক্তি। আর এই চিন্ময়ী মা-ই শত্রুনাশিনী, মোদয়িত্রী ও পালনকর্মী। ভারতমাতা তাই প্রাণবন্ত, সমৃদ্ধ, শক্তিশালী ও আধ্যাত্মিক চেতনার উৎসরূপে বন্দি। এই দৃষ্টির সুন্দর প্রকাশ হয়েছে অথর্ববেদের ভূমিসূক্তে।

জীবনদায়িনী ভারতমাতা

এই ভূমিসূক্তে ভূমিরূপী মা স্বাভাবিক সৌন্দর্য, দয়া, করুণা ও আশ্রয়দাত্রীরূপে প্রকাশিত। বৈদিক ঋষি সেই সত্যই উপলব্ধি করে বলেছেন—পৃথিবী তাঁর মাতা। তিনি পৃথিবীর পুত্র।^২ মা ও সন্তানের এমন ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধকেই ঋষি পৃথিবীর সঙ্গে নিজের সন্তাকে আত্মীয়তার সূত্রে গাঁথতে চেয়েছেন। সেই মা বসুন্ধরা। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়—

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং।

শস্যশ্যামলাং মাতরম্। বন্দে মাতরম্।।

এই পঙ্ক্তিতে মাতৃভূমির যে চিত্ররূপ অঙ্কিত হয়েছে, তা শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা নয়; বরং ঋত, সত্যে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের নৈতিকতার সুষম প্রকাশ। এখানে মাতৃভূমি পর্যাপ্ত জল, উর্বর ভূমি, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র এবং শীতল সমীকরণের আধারস্বরূপ। অসীম বৈচিত্র্যে পূর্ণ সেই মায়ের স্বরূপ বর্ণনার আগে ঋষি অনুভব করেন যে, পৃথিবীর অস্তিত্ব কতকগুলি মৌলিক নীতির ওপর নির্ভরশীল। প্রথম মন্ত্রেই তাই বলা হয়েছে, সমস্ত জগৎকে ব্যাপ্ত করে আছে যে অবিদ্যমানী বৃহৎ সত্তা, তেজস্বী মহাজাগতিক নিয়ম যাকে আশ্রয় করে সেই বিশ্ব সদা সচল, যে কোনো কর্মের অনুষ্ঠানকারী নৈতিক শক্তি পৃথিবীকে ধারণ করে আছে। সেই পৃথিবীই আমাদের সমস্ত ভূত ও ভবিষ্যতের পালিকা। সমগ্র বিশ্বের চালিকা শক্তি।^৩ এই পৃথিবী বীর্ষবতী, ওষধিসমূহের ধারণকর্ত্রী, নদী, সমুদ্র, শস্য-ফসলে পরিপূর্ণ। পৃথিবী সব কিছু দিয়ে আমাদের লালন-পালন করেছেন।^৪ যিনি সমগ্র বিশ্বকে ভরণ-পোষণ করেন, যিনি সম্পদের আধার, প্রতিষ্ঠাদাত্রী বা স্বয়ং প্রতিষ্ঠা, হিরণ্যরক্ষা এবং জগতের স্থাপনকারিণী, সেই পৃথিবী বৈশ্বানর অর্থাৎ সমস্ত জগতের অগ্নিকে ধারণ করেন; যাঁর কাছে ইন্দ্র ব্যতীত — সেই মাতৃরূপিণী পৃথিবীই সকল সম্পদের আধারস্বরূপ।^৫

এ প্রসঙ্গে মার্কণ্ডেয় পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য খণ্ডের এক-নবতম অধ্যায়ের ৪৮ ও ৪৯ সংখ্যক দুটি শ্লোকে শাকম্ভরী দেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। দেবী সেখানে বলেছেন, “হে দেবগণ! অতিবৃষ্টির সময়ে আমি আমার নিজের দেহ থেকে বিনির্গত প্রাণসঞ্জীবনী শস্যসমূহের দ্বারা সমস্ত জগদ্বাসীর ভরণ-পোষণ করব, একারণে আমি বিশ্ববাসীর নিকট শাকম্ভরী নামে বিখ্যাত হব।”^৬ প্রসঙ্গত, আমরা শাকম্ভরী দেবীর রূপটি স্মরণ করব। শাকম্ভরী পদ্মবনে বাস করেন, তিনি চতুর্ভুজা। একটি হাতে বাণের দ্বারা পরিপূর্ণ মুষ্টি, আর একটিতে আছে পদ্ম। তৃতীয় হাতটি অনন্ত রসবিশিষ্ট, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, জরা মৃত্যুহরণকারী ফুল-ফল-পাতা মূলযুক্ত শাকরাশিতে পরিপূর্ণ। চতুর্থ হাতে তিনি উজ্জ্বলকাস্তি ধনু ধারণ করে আছেন।^৭ দেবীভাগবতে বলা হয়েছে, কোনো এক সময়ে একশো বছর বৃষ্টি না হওয়ার ফলে পৃথিবীতে আর কোনো শস্য উৎপত্তির উপায় ছিল না, তাই ভগবতী শাকম্ভরী নিজের শরীরজাত শাকসমূহ দিয়ে জীবের পোষণ করেছিলেন। যতদিন নতুন শস্য উৎপন্ন হয়নি, ততদিন দেবী সব প্রাণীকেই তাদের আহারের উপযোগী নানা রসপূর্ণ খাবার প্রদান করেছেন। সেই সময়ে তিনি শাকের দ্বারা সৃষ্টির সকলকে ভরণ করেছিলেন বলে তাঁর

শাক্তরী নাম প্রচারিত হলো। এই শাক্তরী দেবীই দুর্গাপূজায় নবপত্রিকারূপে পূজিতা হন। রামায়ণে ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দুর্গা যে শস্যপট্টাধীকরূপে পূজিতা হতেন, তার উল্লেখ আছে। শরৎকালে শস্যের শ্রীবৃদ্ধি কামনায় নবপত্রিকার পূজা হয়। আর চৈত্রের শুক্লা অষ্টমীতে এই দেবীরই পূজা হয় অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণারূপে। এই মাতৃকাশক্তিই বক্ষিমচন্দ্রের সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শস্যশ্যামলা। বক্ষিমচন্দ্রের ‘মা’ তাই কেবল প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের সমষ্টি নন; তিনি সকলের প্রাণস্বরূপা, প্রাণদাত্রী, প্রাণরক্ষয়িত্রী ও সভ্যতার প্রতীক।

বক্ষিমচন্দ্র যে মাতৃভূমিকে ‘শস্যশ্যামলাম্’ বলে বন্দনা করেছেন, সেই মাতৃভূমি শুধু উর্বর জমি নয়, তিনি জীবনের লালন-পালনকারিণী, অন্নদাত্রী এবং সকল জীবের আশ্রয়দাত্রী ‘মা’-রূপে প্রতীয়মানা। তাই ঋষির মননে সবুজ শস্যে ভরে ওঠা ভূমি যেন শাক্তরী দেবীরই প্রকাশ, যিনি প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করে জীব-জগৎকে ধারণ ও পালন করেন। আর ‘শস্যশ্যামলাং’ শব্দটি বৈদিক পৃথিবীর মাতা, পৌরাণিক শাক্তরী এবং শাক্তধারায় জগন্মাতা—এই তিনটিকে একত্রে সমন্বিত করেছেন।

বৈদিক ঋষি ভূমিসূক্তে বলেছেন—বিশ্বদাত্রী অর্থাৎ সকল বস্তুর দানকারিণী পৃথিবীকে দেবতারা নিদ্রাহিত হয়ে অপ্রমত্তভাবে বা প্রমাদহীনভাবে রক্ষা করেন, তাই পৃথিবী সমগ্র জীব-জগতের প্রিয় মধুময় বিষয়সমূহ প্রদান করেন, তেজ অর্থাৎ দীপ্তির দ্বারা সিঞ্চিত করেন।^৮

ভারতভূমি তাই আমাদের তেজ ও শক্তি সমন্বিত উত্তম রাষ্ট্র প্রদান করেছে।^৯ যেখানে পরিক্রমণশীল জলরাশি দিবা-রাত্র সমানভাবে প্রমাদরহিত-ভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সেই পৃথিবী আমাদের জন্য বহুশ্রোতা হয়ে জল বা দুগ্ধ ক্ষরণ করেন, তেজের দ্বারা আমাদের সিঞ্চিত করে থাকেন।^{১০} ভারতীয় সভ্যতার তিনটি মৌলিক স্তম্ভ—জীবন, সমৃদ্ধি এবং অন্ন। ভারতভূমি তথা মাতৃভূমি সেই শক্তি, যিনি এই তিনটি মূল উপাদানের ধারক ও দাত্রী। দেবী শাক্তরী, অন্নপূর্ণা এবং পৃথিবী—এঁরা সকলেই অন্ন, কৃষি, উর্বরতা ও জীবনরক্ষার অধিষ্ঠাত্রী। বক্ষিমচন্দ্রের ভাষায় মাতৃভূমি ভারতবর্ষ এই দেবীভাবেরই প্রকাশক্ষেত্র।

মঙ্গলময়ী ও কান্তিরূপিণী ভারতমাতা

‘বন্দে মাতরম্’ সঙ্গীতের পরবর্তী পঙ্ক্তি—

“শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত--যামিনীং

ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল-শোভিনীম্।

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং সুখদাং

বরদাং মাতরম্। বন্দে মাতরম্।”

ভারতমাতার অঙ্গনে রাত্রিকাল শুভ্র জ্যোৎস্নায় পুলকিত। ঋগ্বেদসংহিতার দশম মণ্ডলের অন্তর্গত রাত্রিসূক্তে দেখা যায়, রাত্রিদেবী চারিদিকে বিস্তার লাভ করে তাঁর আগমনের বার্তা জনমানসে প্রকাশ করেন। তিনি নক্ষত্রসমূহের দ্বারা সকল প্রকার শোভা সম্পাদন করেন।^{১১} যাস্কাচার্যের মতে, ‘রম্’ ধাতুর সঙ্গে ত্রিপি প্রত্যয়যোগে রাত্রি শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। যে সময়ে প্রাণিবর্গ স্ব স্ব কর্ম

থেকে বিরতি নেয়, ওই সময়ই রাত্রি—‘উপরমস্তি দিবাচরাঃ সব্যাপারেভ্যঃ’^{১২} দিনের বেলায় সূর্যের আলোয় যেভাবে শস্যশ্যামলা ভারতমাতা প্রকাশিত হন, একইভাবে রাতের বেলায় রাত্রিদেবীর জ্যোতির উদ্গমেই অন্ধকার নাশ হয়।^{১৩} পাখিদের আশ্রয় যেমন বৃক্ষ, তেমন কল্যাণকারিণী রাত্রিদেবীর জেগে উঠে আমাদের সুস্থিতি ঘটে। জগতের সকল প্রকার রব রাত্রিদেবীর আগমনেই নীরব হয়। পশু-পাখি প্রভৃতি সকলই ভারতমাতারূপিণী নিদ্রাদেবীর কোলে নিজেদের সমর্পণ করে। ভারতমাতার কোলে দিব্য অলঙ্কারভূষিতা, কল্যাণকারিণী প্রস্তুতিত ফুল ও বৃক্ষরাজিতে সুশোভিতা, হাস্যময়ী, মধুরভাষিণী এবং সুখ ও বরদানকারী রাত্রিদেবী স্বর্গস্থ দেবকুল এবং পৃথিবীস্থ প্রাণিকুলকে, স্থাবর-জঙ্গমকে সমাবৃত করে রেখেছেন বা বলা ভালো, রক্ষা করে চলেছেন। তাই বলা যায়, ভারতমাতার কোল যেন সমগ্র প্রাণিকুলের উত্তম আশ্রয়। এই পঙ্ক্তিতে বক্ষিমচন্দ্র ভারতমাতার এমন এক রূপ প্রকাশ করেছেন, যেখানে চাঁদের শান্ত ও স্নিগ্ধ আলোয় রাত্রিকাল যেন মানব, জীব-জগৎকে আন্তর-আনন্দ প্রদান করে। ফুলে-ফলে ভরে থাকা গাছপালা যেন অপরূপ প্রাকৃতিক মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যের দ্যোতক। এইভাবে ঋষি বক্ষিমের গভীর মননে মাতৃরূপিণী ভারতভূমির ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য ও মাধুর্য উন্মোচিত হয়েছে যা আজও সর্বসাধারণের অন্তরে নাদরূপে সর্বদা অনুরণিত হয়। মাতৃভূমি ভারতের এই শান্ত, স্নিগ্ধ পবিত্র ও সমৃদ্ধ রূপচিত্রটি ভারতবাসীর আন্তর দেশপ্রেম ও গভীর শ্রদ্ধা উদ্দীপ্ত করে।

ভারতমাতা সদা হাস্যময়ী, মধুরভাষিণী এবং সুখ ও বরদানকারী। ভারতীয় শক্তিসাধনায় আদ্যাশক্তির সৌম্য ও করুণাময় প্রকাশ বহুবার নানা শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায় বিবৃত হয়েছে। এইরূপে তিনি ভয়ঙ্করী নন; তিনি স্নেহময়ী জননী, আশ্রয়দাত্রী, অভয়দাত্রী ও বরদা। মায়ের মুখ সবসময়ই প্রসন্ন হাসিতে পরিপূর্ণ, তাঁর মুখ-নিঃসৃত কথাগুলি সবসময়ই মধুময়, যা তাঁর সন্তানকে সুখ ও বর প্রদান করে। মাতৃরূপিণী শক্তির প্রসন্নতায় সকল বাধা, সঙ্কট দূরীভূত হয়। দেবীমাহাত্ম্যে এই ভগবতী অম্বাকে প্রসন্ন হওয়ার প্রার্থনা জানানো হয়েছে।^{১৪} দেবীর প্রসন্ন মুখই ভক্তের পরম আশ্রয়। মায়ের মধুময়ী ভাষা যেন মাতৃসন্তার জ্ঞান, প্রেম, করুণার একত্র সম্মেলন। মায়ের ভাষায় সন্তানের প্রতি মায়ের মায়া, মমতা, স্নেহ—এই সবেরই প্রকাশ হয়। ঋষি বক্ষিম এই পঙ্ক্তির মাধ্যমে এটাই বোঝাতে চেয়েছেন, একমাত্র ভারতমাতার গর্ভ থেকেই প্রাচীন বেদের মন্ত্র, ঔপনিষদীয় আত্মতত্ত্ব, কুরুক্ষেত্রে শ্রীভগবানের গীতার উপদেশ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের জীবনদর্শন, নৈতিকতা, মূল্যবোধ জন্ম নিয়েছে। এই সকল বৈদিক ও পৌরাণিক ভাষা আমাদের জীবন-দর্শনে ভারতীয় সংস্কৃতির একের বীজ বপন করে রেখেছে। করে চলেছে।

প্রসঙ্গত, আমরা এখানে ঋগ্বেদের দেবী সূক্তকে স্মরণ করতে পারি। এই সূক্তের ঋষি মহর্ষি অম্বুগের কন্যা বাক্। তিনিও একজন মন্ত্রদ্রষ্টা। একবার বাক্ পরাশক্তিকে আপন আত্মরূপে প্রত্যক্ষ করেন। তারপর ব্রহ্মরূপিণী হন। সেদিন এক অপূর্ব উপলক্ষিতে তাঁর অন্তর উদ্ভাসিত হলো। তিনি বলে উঠলেন^{১৫}—“আমি সমগ্র জগতের ঈশ্বরী, উপাসকদের সব ধন আমিই দিই। আমি স্বাত্মরূপে ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ

করেছি, আমি ব্রহ্ম। আমি যজ্ঞীদের মধ্যে প্রথম-স্থানীয়া। বহুভাবে প্রপঞ্চরূপে আমি অবস্থিতা, সকল ভূতে জীবভাবে প্রবিষ্টা। সেইজন্য সমগ্র দেশে জ্ঞানী ব্যক্তিরা আমারই আরাধনা করে।” এই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে, বাগ্‌দেবীই সমগ্র জগতের প্রধান। বাক বা শব্দ দিয়েই তো ভাষার প্রকাশ। সেই ভাষা যখন সুমধুরা মায়ের মুখনিঃসৃত তখন তা জগতের প্রাণস্বরূপ। বাগ্‌দেবী নিজের স্বরূপ উন্মোচন করে বলেছেন— “আমিই কারণরূপে বিশ্বভুবনের উৎপত্তিস্থল এবং আমিই স্বয়ং বিশ্বভুবনরূপে বর্তমান। বায়ুর মতো সহজে আমি বিশ্বের মধ্যে অন্তরে ও বাইরে বিচরণ করি। ব্রহ্মচৈতন্যরূপে আমি আকাশের সীমা পেরিয়ে গিয়ে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে, এই পৃথিবীকেও ছাড়িয়ে অবস্থান করছি। আবার স্ব-মহিমায় দ্যৌ-পৃথিবীরূপ অর্থাৎ জগৎ প্রপঞ্চরূপে প্রকাশিত হয়েছে।”^{১৬} বাক্‌রূপিনী মায়ের ভাষাই তাহলে জগৎ প্রপঞ্চের মূল আধার। যে ভাষা সত্য, জ্ঞান ও ধর্মের বাণীরূপে ঐক্য, স্বদেশ প্রেমের আহ্বান জানায়। মধুরভাষিণীরূপে বক্ষিমচন্দ্র ভারতমাতার যে অলঙ্করণ করেছেন তা ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ঐক্যসূত্রে আজও গেঁথে রেখেছে।

এই ভারতমাতাই সুখদা, বরদা। তিনি একদিকে যেমন সমগ্র ভারতবাসীকে সুখ প্রদান করেন, তেমনি বর প্রদানও করে থাকেন। সুখ মানুষকে সর্বপ্রকারে সমৃদ্ধ ও সর্বথা পূর্ণ করে। ‘সুষ্ঠু খং যস্মাৎ তৎ সুখম্।’ ‘খ’ মানে আকাশ, এখানে আকাশ বাকি চারটি ভূতের অর্থাৎ বায়ু, অগ্নি, জল ও মাটিরও প্রতিনিধি। তাই সুখের অর্থ দাঁড়াল—আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূত এবং ভৌতিক পদার্থসমূহ যে তত্ত্বে বা স্থিতিতে সুষ্ঠু, সুন্দর ও অনুকূলবোধক হয়, তা-ই সুখ। সুখ-ই আত্মা, শ্রুতি বলছেন— ‘তস্যৈ বানন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।’^{১৭} এই প্রেক্ষায় সুখ বলতে বৈষয়িক সুখকেও বোঝাবে। তখন ব্যুৎপত্তি হবে এইরকম—‘সুষ্ঠু শোভনানি প্রসন্নানি খানি—শ্রোত্রপ্রভৃতীনি ইন্দ্রিয়াণি যস্মাৎ’ অর্থাৎ যে অনুভব হলে মানুষের ইন্দ্রিয়গুলি প্রসন্ন ও স্ফুর্তিসম্পন্ন হয়, তা-ই সুখ। মা তাঁর সন্তানের কাছে যেভাবে সুখের জন্য, ভালো থাকার জন্য সবরকম উপকরণ সামনে এনে দেন, ঋষি বক্ষিমের দৃষ্টিতে ভারতমাতাও আমাদের সকল সন্তানের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, সম্মান সহ ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি—এই সব কিছু দিয়েই লালন-পালন করে চলেছেন। সেই ভারতমাতাই আবার আমাদের যা ‘বর’ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সেই বিষয়ও প্রদান করেন। মানুষের জীবনযাত্রার পথে পুরুষার্থ চারটি—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ভারতমাতা ভারতীয় সংস্কৃতির অঙ্গনে সমগ্র মানবজাতির জীবনের পরম আদর্শরূপে চতুর্বিধ পুরুষার্থের প্রদাত্রী। পুরুষার্থ তো মানুষের শক্তি, সমৃদ্ধির আধার। মানুষের স্বভাব হলো সে যে পরিস্থিতিতে অবস্থান করে তার থেকে আরও ভালো পরিস্থিতি অর্থাৎ উন্নতির জন্য সবসময় চেষ্টা করে। এই উন্নতি প্রাথমিকভাবে জাগতিকই। তাকে বলা হয় অভ্যুদয়। কিন্তু অভ্যুদয় তো সাময়িক। অভ্যুদয়ের চেহারা চিরকাল একরকম থাকে না! অপরদিকে মানুষকে তো সুখে থাকতে হবে চিরকাল—এই আকাঙ্ক্ষায় তার উত্তরণ হয় নিঃশ্রেয়সে। ধর্মের সঙ্গে মানুষের প্রথম

পরিচয় ও প্রয়োজন হয় অভ্যুদয়ের হেতুরূপে।^{১৮} সেই ধর্মনির্দিষ্ট কর্মের প্রতি মানুষের যে প্রেরণা, সেটাও ‘ধর্ম’ বলেই পরিচয় দিয়েছেন জৈমিনি।^{১৯} ধর্ম হলো স্বভাব, পরিচয়, নিয়ম, প্রেরণা, প্রাপ্তি—যার সব ক’টিই মানুষের প্রাণে প্রকাশিত হয় মায়ের হাত ধরে। বক্ষিমও ভারতমাতা যে সমগ্র ভারতবাসীর চেতনায় তপস্যা, অহিংসা, সত্য, ঋত, দয়া, দান, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, সদাচার—এইসব ধর্মীয় গুণাবলীর উদ্ভাসন ঘটান—এই বিষয়টি তাঁর কালজয়ী রচনায় আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া শাস্ত্রমুখেও তো জানা যায় যে, ভারতভূমিই বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, পুরাণ ও নানা দর্শনশাস্ত্রের জন্মক্ষেত্র। ভারতমাতার কোলেই মানবজাতি ধর্ম, ন্যায়, সত্য, অহিংসা, করুণা, মুদিতার শিক্ষা অর্জন করে। তাই ভারত ধর্মদাত্রী।^{২০} ধর্মই সমগ্র জগতের ভিত্তিপ্রস্তর। মাতৃরূপে ভারতভূমি বরদা হস্তে মানবসমাজকে ধর্ম দান করেন। মানবতা প্রদান করেন। সকলকে একাত্মতার অভিমুখে প্রেরিত করেন।

এই ভারতমাতাই কিন্তু মানবজাতির জীবন ধারণের জন্য উপযুক্ত বস্তুর জোগান দেন, তা রক্ষা করেন ও সেই সবার বৃদ্ধিও ঘটান। তাই বলা যায়, মাতৃরূপে ভারতভূমি মানবজাতিকে ‘অর্থ’ ও সংগ্রহ করে দেন। পুরুষার্থের অন্তর্গত ‘অর্থ’ শব্দের দ্বারাও মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করাকেই বোঝায়। কৌটিল্য রচিত অর্থশাস্ত্রের দৃষ্টিতে ‘অর্থ’ শব্দের মুখ্য অর্থ হলো ‘ভূমি’। কৌটিল্য অবশ্য মানুষের বৃত্তিকেও অর্থ বলেছেন। ‘মনুষ্যাণাং বৃত্তিঃ অর্থঃ। মনুষ্যবতী ভূমিরিত্যর্থঃ।’^{২১} মানুষের যাবতীয় জীবিকার যা মূল্যধার বা উৎস তা-ই অর্থ। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে ধন, ধান্য, বস্ত্র, বাড়ি ঘর ইত্যাদি বাঁচার জন্য যা যা প্রয়োজন তার যে প্রধান উৎস, সেটাই অর্থ। যেহেতু ‘মাটি’ই সকল প্রাণীর সুস্থির আধার, তাই ‘মাটি’ও অর্থ। মহর্ষি শুক্লাচার্য ‘মাটি’র মহিমা কীর্তন করে বলেছেন, মাটি হলো সব প্রাণীরই সুখের খনি।^{২২} আচার্য বাৎস্যায়নের মতে, বিদ্যা, ভূমি, সোনা-রূপা, পশু, ধনধান্য, বাসনকোসন, বন্ধু ইত্যাদির অর্জন, রক্ষণ ও বর্ধনই হচ্ছে অর্থ।^{২৩} মহাভারতকার বলেছেন, কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা, শিল্প এমনি নানা উপায়, যার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ ঘটে থাকে, তাকে অর্থ বলে ভাবা যেতে পারে।^{২৪} সুতরাং নানা শাস্ত্রের পরিক্রমায় বলাই যায়, ভারতমাতা অর্থদাত্রী। উর্বর ভূমি, নদী, বন, খনিজ, কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যের মাধ্যমে ভারতমাতা তাঁর সন্তানদের জীবিকা ও সমৃদ্ধি দান করেন। ‘সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা’ বিশেষণগুলিই তাঁর অর্থদাত্রী রূপকে উন্মোচিত করে।

প্রাণিকুলের জীবনযাপনের যা কিছু সুখ-সামগ্রী, তা-ই কাম। কাম থেকেই আমরা কাঙ্ক্ষিত কর্ম সম্পন্ন করে থাকি, ইন্দ্রিয়রাও সুখ অনুভব করে থাকে। তাই ধর্ম, অর্থের মতোই কামও পুরুষার্থের মর্যাদা লাভ করেছে। বক্ষিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে ভারতমাতা তাই কামদাত্রীও। এখানে কাম বলতে শুধু ইন্দ্রিয়সুখ নয়; শাস্ত্রসম্মত, ন্যায়সঙ্গত ও সৌন্দর্যময় জীবন যাপনের সকল শুভ আকাঙ্ক্ষাকেও বোঝায়, যা ভারতীয় সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে মানুষের জীবনকে আনন্দময় ও পরিপূর্ণ করে। সেই অর্থে বরদা অর্থে ভারতমাতা জীবকুলকে কাম প্রদানও করে থাকেন।

আবার এই ভারতমাতা মোক্ষও দান করেন। মুক্তি লাভের জন্য একমাত্র সাধনক্ষেত্র হলো ভারতভূমি। এখানেই বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বেদান্ত-এর অসংখ্য মুনি-ঋষি আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন এবং সমস্ত জীবকুলকে সেই মোক্ষমার্গের পথিকও করেছেন।^{২৫} এই কারণে ভারতমাতা মোক্ষের পথও প্রদর্শন করেন। ভারতীয় ও সনাতনী ছাড়া অন্যের কাছে ‘মোক্ষ’রূপ অমূল্য সম্পদের সংবাদও পাওয়া যায় না।

ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চার পুরুষার্থ অর্জনের প্রধান উপায় মানবজীবন। মাত্ররূপে ভারতভূমি সেই জীবন, সংস্কৃতি, জ্ঞান ও জ্ঞানলাভের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ দান করেন। তাই এখানেই চারটি পুরুষার্থ প্রাপ্তি সম্ভব হয়। ভারতমাতা তাই বরদা। শুধুমাত্র জাগতিক বস্তুগত বরই তিনি দান করেন না; বরং ধর্মের আদর্শ, অর্থের জোগানের উপায়, কামের বিশুদ্ধ প্রয়োগ এবং মোক্ষরূপ পরমপদও প্রদান করেন। এই কারণেই ঋষি বঙ্কিম ভারতমাতাকে সুখদা বরদারূপে বন্দনা করেছেন।

ভারতমাতার বীর্ষ, সংহতি ও আত্মশক্তি

বন্দে মাতরম্ সঙ্গীতের পরবর্তী পংক্তি—

সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিদাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃত-খরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে!
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং,
রিপুদল-বারিণীং মাতরম্।

এই পঙ্ক্তিতে কোটি কোটি মানুষের একত্র কণ্ঠস্বর জাতির ঐক্যবদ্ধ, সম্মিলিত ঐক্যের প্রতীককে নির্দিষ্ট করেছে। ঠিক যেভাবে প্রাচীন বৈদিক সংজ্ঞান সূক্তে সকলকে সমবেত হওয়ার ঐকমত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। এই সূক্তে একই সঙ্গে, একই ভাবনায় ভাবিত হয়ে সকলকে একই লক্ষ্যে চলার কথা বলা হয়েছে। ঐকমত্যের এই ভাবনাই সংজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান। সম্মিলিত হওয়া ভাবগৌরবে বিশেষ সমৃদ্ধ এবং ভারতীয় ঐতিহ্যের মর্মকথার দ্যোতক। বেদের ঋষিই বিশ্বমানবের এক উদার মিলনক্ষেত্র রচনায় সকলকে আহ্বান করেছেন। বিশ্ববিধাতার লীলাচ্ছলে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের মধ্যে বিভেদের বেড়া জাল বাঁধেন। এই বিভেদ তাদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে, যার ফলে মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্য হয়। তাই ঋগ্বেদসংহিতার সংজ্ঞান সূক্তে ঋষি সমগ্র মানবজাতিকে একাত্মতার ঐক্যমন্ত্রে সঞ্জীবিত করতে চেয়েছেন—‘সংগচ্ছধ্বংসং বদধ্বংসং বো মনাসি জানতাম্’—‘তোমরা মিলিত হও, একত্রে স্তব উচ্চারণ কর, তোমাদের মন পরস্পর একমত হোক।’^{২৬} যজ্ঞভাগ গ্রহণে দেবতাদের মধ্যে যেমন কোনো দ্বন্দ্ব দেখা যায় না, তেমনি মানব সাধারণের অন্তঃকরণ ও অভিপ্রায় এক হলে,^{২৭} একই মন্ত্রে মন্ত্রিত হলে তাদের আর কোনো বাধা থাকে না। ঋষি সংবননের কণ্ঠে ঐক্যবন্দনার এই মন্ত্রটি কেবল প্রাচীন ভারতের নয়, আধুনিক ভোগসর্বস্ব বিভেদদীর্ঘ জগতেরও মর্মবাণীরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। ঋষি বঙ্কিমও এই মন্ত্রে ভারতমাতাকে জাতীয় ঐক্যের জীবন্ত প্রতীকরূপে প্রকাশিত করেছেন।

ভারতমাতা কোটি কোটি মানবের সম্মিলিত প্রয়াসে শক্তি, কর্ম, আত্মরক্ষা ও ধর্মরক্ষার প্রতীকস্বরূপ। ভারতবাসীর কোটি কোটি বাহু কেবলই অস্ত্রশস্ত্র ধারণে শক্তিশালী নয়, তারা তেজ, বীর্ষ, ওজঃ, সহিষ্ণুতা এবং ধর্মরক্ষার আদর্শে বলীয়ান নাগরিক। কৃষ্ণ-যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকে পরম শক্তির কাছেও তেজ, বীর্ষ, বল, ওজঃ, উদ্যম শক্তি ও সহন শক্তির প্রার্থনা করা হয়েছে।^{২৮} সম্মিলিত রাষ্ট্র নাগরিক তাই চরিত্র, জ্ঞান, নৈতিকতা ও আত্মসংযমের সমন্বিত শক্তি। ভারতের মাটিতেই ব্রহ্মতেজে দীপ্ত ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন, আবার বীর, ধনুর্ধর, মহরথী ক্ষত্রিয়রাও এই ভারতমাতারই সন্তান। ব্রাহ্মণদের জ্ঞাননৈপুণ্যে আর শূদ্রের সেবানৈপুণ্যে ভারতমাতা শক্তি-সমৃদ্ধি। অথর্ববেদের রাষ্ট্রাভিবর্ধন সূক্তে দেখা যায়, ঋষি বশিষ্ঠ, অভিবহুনি অথবা ব্রাহ্মণস্পতি দেবতার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, “হে রাজন্! আমাদের প্রতি বিদ্রোহ পোষণকারী, হিংস্র ও শত্রুভাবাপন্ন যে সকল শত্রুসেনা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত, আপনি তাদের পরাভূত করুন। সমগ্র প্রাণিজগতের ওপর ন্যায়সঙ্গতভাবে আপনাকে শাসনভার গ্রহণে দেবশক্তি সহায়তা করুন। সূর্যদেব উদিত হয়ে আপনার রাষ্ট্রকে তেজ, জ্যোতিঃ ও সমৃদ্ধিতে আলোকিত করুন। আমাদের শুভ ও সত্যনিষ্ঠ বাণী সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। আপনি শত্রুবিনাশী, পরাক্রান্ত ও বিজয়ী হয়ে আমাদের রাষ্ট্রের অনুকূল এবং প্রজাসাধারণের কল্যাণে সদা নিয়োজিত থাকুন।”^{২৯}

রাষ্ট্রাভিবর্ধন সূক্তে যেখানে ন্যায়পরায়ণ রাজার মাধ্যমে রাষ্ট্ররক্ষা ও প্রজাকল্যাণের প্রার্থনা করা হয়েছে; সেখানে ভারতমাতা সেই রাষ্ট্রশক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্তিরূপে কল্পিত হয়েছেন। এই কারণেই কোটি কোটি ভারতবাসীর সম্মিলিত কণ্ঠই রাষ্ট্রাভিবর্ধন সূক্তের বৈদিক রাষ্ট্রচেতনার এক অব্যর্থ মন্ত্র, যা জাতীয়তাবোধের উদ্দাম করে। ধর্মনিষ্ঠতা আনে। সামূহিক দুর্বলতা বিনষ্ট করে।

ভারতমাতা কখনই অবলা নন; তিনি শক্তিরূপে সকল প্রাণীর মধ্যে অবস্থান করছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর পঞ্চম অধ্যায়ে দেবীদূত-সংবাদে দেখা যায়, দেবী সকল প্রাণীতে শক্তিরূপে অধিষ্ঠিতা থাকেন।^{৩০} নাগোজী ভট্ট শক্তি বলতে কার্যজনন সামর্থ্যকে বুঝিয়েছেন। তত্ত্বপ্রকাশিকায় শক্তি সামর্থ্য বা উৎসাহকে বোঝায়। শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথদেব শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রণবপ্রেমামৃত ভাষ্যে বলেছেন, শক্তি শারীরিক বল। নিঃস্বার্থ পরোপকার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হলেই তা সাত্ত্বিক। ন্যায় স্বার্থরক্ষায় প্রযুক্ত হলে তা রাজস এবং অন্যান্য কার্যে প্রযুক্ত হলে তা তামস।^{৩১} প্রসঙ্গত, ত্রিক্সিদ্ধান্তসম্মত শক্তিতত্ত্বটি স্মরণ করে কীভাবে দেবী সকল প্রাণীতে শক্তিরূপে অবস্থান করেন, তা দেখে নেব। পরমেশ্বরের হৃদয়ে সিসৃক্ষা উৎপন্ন হওয়ামাত্র তিনি দুইরূপ হয়ে যান। শিবরূপ ও শক্তিরূপ। শিব প্রকাশরূপী এবং শক্তি বিমর্শরূপিণী। ‘বিমর্শ’ শব্দের অর্থ এখানে পূর্ণ অকৃত্রিম অহং-এর স্ফূর্তি। এই স্ফূর্তি সৃষ্টিতে বিশ্বাকারে, স্থিতিতে বিশ্বপ্রকাশে এবং সংহারে বিশ্বসংহরণরূপে প্রকাশিত হয়।^{৩২} উপনিষদ্ বলেছেন—‘বলমসি’ আপনি হলেন ‘বল’।

ভারতমাতা এমন এক সর্বশক্তিময়ী জননী, যিনি অসংখ্য শক্তির আধার, জ্ঞান ও ধর্মের দ্বারা সন্তানদের মুক্তির পথে পরিচালিত

করেন। আবার সমগ্র ভারতবাসীর অন্তর ও বাহ্য সকল শত্রুকে পরাভূত করার শক্তি প্রদান করেন। দেবীসূক্তে দেবী বলছেন, “যাকে ইচ্ছা আমি বলবান, অথবা স্তোতা, অথবা ঋষি, অথবা বুদ্ধিমান করতে পারি। যিনি শত্রুকে বধ করতে উদ্যত হন, তখন আমিই তাঁর ধনু বিস্তার করে দিই। লোকের জন্য আমিই যুদ্ধ করি।”^{৩৩} এর থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বৈদিক ঋষি সমস্ত প্রাণী, মনুষ্য, দেবতা এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে এক দেবীশক্তি নিহিত আছেন, সেটা স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। ঋষির দর্শনে উদ্ভাসিত এই দেবীশক্তিই বক্ষিমচন্দ্রের চেতনায় যুগপ্রয়োজনে ভারতমাতারূপে প্রকটিত। তিনি সকল আশ্রিতের দুঃখহারিণী, বিশ্বজননী, বিশ্বেশ্বরী, চরাচরের অধীশ্বরী।^{৩৪} যিনি বিপদ থেকে রক্ষা করেন, দুঃখ হরণ করেন, পরাধীনতা থেকে মুক্তি দেন। শ্বেতাস্বতর শ্রুতিও বলছেন,^{৩৫} পরমেশ্বরের শক্তি বিচিত্র কার্যকারিণী। সেই শক্তি জ্ঞানরূপ বল দ্বারা সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ভারতমাতাও জ্ঞান-বল-ক্রিয়ার অধিষ্ঠাত্রী। অর্থাৎ তিনি জ্ঞান ও বলের সঙ্গে যুক্ত ক্রিয়াশক্তি। জ্ঞান বস্তুর স্বরূপ প্রকাশিকা অন্তঃকরণবৃত্তি, বল অর্থাৎ উৎসাহ এবং ক্রিয়া অর্থাৎ ব্যাপার বা নানা কার্যে জীবকে নিরত করেন। আবার রক্ষাও করেন।

শাস্ত্রে বলেছেন—রিপু অর্থাৎ শত্রু হলো ছয়টি—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎস্যর্য। বেদ, উপনিষদ, গীতা ও পুরাণের আলোকে ভারতমাতা মানুষের অন্তরে জ্ঞান, ধর্ম, সংযম, ত্যাগ, বিনয় ও ঐক্যের চৈতন্য জাগিয়ে ঘড়রিপু নাশ করেন। গীতায় শ্রীভগবান আমাদের ছয়টি আসুরী সম্পদ নাশের কথা শিখিয়েছেন। বলেছেন—দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা ও অজ্ঞান—এই আসুরী প্রবৃত্তি নাশ হলে তবেই আত্মোন্নতি সম্ভব—যা সমগ্র জাতির উন্নতির একমাত্র কারণ। মলিন-চিত্ত, অন্ধ-বুদ্ধি, ত্রুরকর্মা ও অনিষ্টকারী ব্যক্তিরাই জগতের বিনাশের মূল। আর বেদ, উপনিষদ, গীতা, পুরাণ—সবই আমাদের শিষ্টাচার ও সদাচার শিখিয়েছে। যা ধর্ম ও আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদান করে একাত্মতার মন্ত্রে আমাদের দীক্ষিত করে ঐক্যবদ্ধ করে আজও। ঐক্যই শত্রু-শাতন সামর্থ্য।

ভারতমাতা হলেন রিপুদলকারিণী। তিনি মানুষের চেতনায় ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদও আমাদের এই একাত্মতার শিক্ষাই দেয়। ‘সহ নীববতু। সহ নৌ ভুনক্তু। সহ বীর্যং করবাবহৈ।’^{৩৬} অর্থাৎ আমরা একসঙ্গে রক্ষিত হই। একসঙ্গে জ্ঞানলাভ করি, একসঙ্গে শক্তি অর্জন করি। ঐক্যবদ্ধতাই জাতির উন্নয়নের মূল মাধ্যম। গীতায় শ্রীভগবানও এই একই পরামর্শ দিয়েছেন।^{৩৭}

ভারতমাতা : জ্ঞান, ধর্ম, শক্তি ও ভক্তির রূপ

‘বন্দে মাতরম্’-এর চতুর্থ স্তবকে ঋষি বক্ষিমচন্দ্রের উচ্চারণ হলো—

‘তুমি বিদ্যা, তুমি ধর্ম,
তুমি হৃদি, তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,

তোমারই প্রতিমা গড়ি
মন্দিরে মন্দিরে।’

ঋষি বক্ষিমচন্দ্র ভারতমাতার অপরূপ চিত্র এই স্তবকে অঙ্কন করেছেন। ভারতমাতা বিদ্যাস্বরূপা। তিনিই ধর্ম, আবার হৃদয়ের মর্মরূপে সেই মা-ই বিরাজিত। মানবশরীরে প্রাণরূপে সেই মায়েরই স্পন্দন হয়। বাহুতে শক্তিরূপে সেই মা-ই নিয়ত কর্মরতা। আন্তর ভক্তিরূপে সেই মা-ই বন্দিতা। ভারতবর্ষের মন্দিরে মন্দিরে পূজিতা দেবীমূর্তি ভারতমাতারই প্রতীকস্বরূপা। তাই ভারতমাতা বন্দনার আধার স্বরূপা।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর নারায়ণী স্তুতিতে দেবীকে সমস্ত বিদ্যার মূর্তিস্বরূপা^{৩৮} বলে বন্দনা করা হয়েছে। শাস্ত্রে বিদ্যা আঠারো প্রকার। সেগুলি হলো—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, ঋগ্-যজুঃ-সাম-অথর্ব এই চতুর্বেদ, মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, গন্ধর্ববেদ, অর্থশাস্ত্র—এই আঠারো প্রকার বিদ্যা।^{৩৯} বিষ্ণুপুরাণে বিদ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, যজ্ঞবিদ্যা, মহাবিদ্যা, গুহ্যবিদ্যা, মুক্তিফলদায়িনী আত্মবিদ্যা, আত্মক্ষিকী বিদ্যা, ত্রয়ী, বার্তা, দণ্ডনীতি সব-ই দেবীস্বরূপা।^{৪০} ভারতমাতা জ্ঞানের আধার। প্রজ্ঞার আধার। আত্মমুক্তির একমাত্র ক্ষেত্র ভারতবর্ষ। মুনি-ঋষিদের জ্ঞানসাধনার এই ভূমি ভারত। তাই জননী ভারতমাতা হলেন জ্ঞানস্বরূপা ও জ্ঞানময়ী। যিনি আমাদের অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে অমৃত উত্তরিত করেন।

দেবী মুক্তিদায়িনী নারায়ণী সকল ব্যক্তির হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করেন।^{৪১} ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের গণেশ খণ্ডে সপ্তম অধ্যায়ে নারায়ণ স্বয়ং বলছেন—“যিনি বিশ্বের সৃষ্টিকারিণী, প্রকৃতি ও সকলের পরমা জননী এবং যিনি মৎপরা ও মম সদৃশ, তিনিই নারায়ণী।”^{৪২} ভারতমাতাও দেবী নারায়ণীরই স্বরূপবিশিষ্টা। উপনিষদেও দু’টি বিদ্যার কথা বলা হয়েছে। পরা ও অপরা।^{৪৩} এর মধ্যে ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ—এই সকলই অপরা বিদ্যা। আর পরা বিদ্যা হলো ব্রহ্মবিদ্যা। আত্মজ্ঞান। ভারতবর্ষই এই বিদ্যাসমূহের আঁতুড় ঘর এবং জননীস্বরূপা।

ভারতমাতা ধর্মস্বরূপা। ধর্ম হলো স্বভাব, পরিচয়, নিয়ম, প্রেরণা, আবার প্রাপ্তিও। ঋক্সংহিতার ভাষ্যে আচার্য সায়ণ ধর্মের ধারণা ও ধারক দু’রকম অর্থই গ্রহণ করেছেন। অথর্ববেদ এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থে যজ্ঞ এবং যজ্ঞের দ্বারা লভ্য পুণ্যফলকে ধর্ম বলা হয়েছে। ধর্ম প্রথমে কর্ম ও তারপরে কর্মের ফলরূপে বিস্তৃত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে ধর্মের তিনটি প্রকার বলা হয়েছে, তার মধ্যে প্রথম ধর্মস্কন্ধ হলো যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান। দ্বিতীয় ধর্মস্কন্ধ হলো তপস্যা অর্থাৎ চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রত। তৃতীয়টি হলো আজীবন আচার্য গৃহে বাস করে ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করে দেহের অবসান। বৃহদারণ্যকে ঋষি বলেছেন, ধর্ম হলো নিয়ামক এবং তার স্বরূপ হলো সত্য। মীমাংসা দর্শনে জৈমিনি বলছেন, যা কিছু মঙ্গলজনক, তাই ধর্ম। ধর্ম প্রসঙ্গে কণাদের মতটি এইরকম—“যতোহভূদয়- নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ।” আবার যা যেখানে যে সম্বন্ধে থাকে তাকেও ধর্মই বলা হয়েছে। ধর্মের প্রধান অর্থ হলো

মানুষের সকল কর্তব্য-কর্ম। কর্তব্য-কর্ম করলে যে ফললাভ হয় অর্থাৎ গুণ্য, তা-ই ধর্ম। ধর্মকে আমরা নিয়মরূপেও দেখি, দেখি ঋত, সত্য রূপে। ধর্ম আরও নানা রূপে এসে ধরা দিয়েছেন ধর্মশাস্ত্রে, বিভিন্ন সংহিতায়। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—

শ্রুতিঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ।

সম্যক্ সঙ্কল্পঃ কামো ধর্মমূলমিদং স্মৃতম্।।

মনু এ প্রসঙ্গে একই কথা বলেছেন। তাঁর মতে ঐগুলি সাক্ষাৎ ধর্মের লক্ষণ। শ্রুতি, স্মৃতি, সদাচার, আত্মতৃপ্তি ও সম্যক্ সঙ্কল্পজ্য কাম— এগুলি হলো ধর্মমূল। আত্মতৃপ্তি আর সঙ্কল্পজন্য যে কাম যাজ্ঞবল্ক্য এদের মাধ্যমেও ধর্মকে চিনতে বলেছেন।

ধর্মের অভিনব ব্যাখ্যা স্বামী বিবেকানন্দের অন্তরাত্মাকে উদ্বোধিত করেছিলেন তাঁর আচার্য গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ। উনিশ শতকের ধর্মীয় আন্দোলনের এক নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণের জীব-শিব তত্ত্বের মধ্য দিয়ে। তিনিই সর্বপ্রথম ধর্মকে নবরূপে তুলে ধরলেন সেকালের ধর্মভ্রষ্ট মানুষের কাছে। যেখানে জীব ঈশ্বরেরই প্রতিমূর্তি। সমগ্র বিশ্বে সেই একটিই পরম সত্তার প্রকাশ। যখনই মানুষের মধ্যে জেগে উঠবে এই সুপ্তবোধ, তখনই সে উপলব্ধি করবে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ। ধর্মের স্থান অন্তরে— ‘ধর্মো হৃদি সমাশ্রিতঃ।’

ভারতমাতা ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রের কলেবরে ব্যক্তি, সমাজ ও বিশ্বকে ধারণ, রক্ষা ও সুসংহত করে রেখেছেন। তিনি আমাদের ধারণ করেন, রক্ষা করেন এবং সমাজকে স্থিতিশীল রাখেন।^{৪৪} ভারতবর্ষ এমন এক ক্ষেত্র যেখানে ঋষি-মুনিদের ধর্ম, সংস্কৃতি, তপস্যা, ন্যায়পরায়ণতা ও আদর্শময় জীবন যুগে যুগে বিকশিত হয়েছে। তাই নির্দিধায় বলা যায় যে, ভারতমাতা সমগ্র ভারতবাসীর অন্তর্নিহিত চেতনা। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেখা যায়, দেবী সমস্ত ভূতের অন্তরে চেতনারূপে অবস্থান করেন।^{৪৫} নাগোজী ভট্ট চেতনা শব্দের অর্থ করেছেন, ‘নির্বিকল্পা যা চিচ্ছক্তিঃ।’ অর্থাৎ নির্বিকল্পা চিৎশক্তি হল চেতনা। এই চেতনাই মর্ম শব্দের পর্যায়বাচী। শ্রীওঙ্কারনাথদেব শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রণবপ্রেমামৃত ভাষ্যে বলেছেন, চেতনা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের প্রবৃত্তিহেতু অন্তকরণ-শক্তি বিশেষের নাম।^{৪৬} তা চিন্তের ব্যাপার-রূপ, জ্ঞানশক্তি প্রধান মহত্ত্বের নাম চিত্ত। মহত্ত্বের দুটি শক্তি—একটি জ্ঞানশক্তি ও অপরটি ক্রিয়াশক্তি। অর্থাৎ চেতনা একাধারে জ্ঞানশক্তি সমন্বিতা ও ক্রিয়াশক্তি সমন্বিতা। এই চেতনা আবার তিন প্রকার—সাদ্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যে জ্ঞান পরম্পরাক্রমে সত্ত্ব নামক অদৃষ্টের বা সুখের বা দুঃখ নিবৃত্তির হেতু অথবা সত্ত্বগুণের হেতু তা-ই সাদ্বিক। যেমন—ইষ্টদেবতার পূজা, শ্রীমন্দির দর্শন। সময়বিশেষে নিজ আত্মীয়ে রত থাকার রাজস, সম্পূর্ণ পরদারাদি-দর্শন তামস। এই চেতন সত্ত্বাই ভারতবাসীর মর্ম। এই চেতনাও ‘মা’। তিনি জাতির আত্মা, আদর্শ, ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক সত্তার কেন্দ্রবিন্দু। জাতির আত্মপরিচয়। জীবনী শক্তি। বেঁচে থাকার আদর্শভূমি। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেতু নির্মাণকারিণী—এই শাস্ত্রমুখে বোঝা যায় যে, ভারতমাতা জ্ঞান, নৈতিকতা, প্রেম, আদর্শ ও আত্মসত্তার আধারস্বরূপ।

তিনিই আবার আমাদের শরীরে প্রাণস্বরূপ। প্রাণ স্থূল পদার্থ

নয়, অত্যন্ত সূক্ষ্ম শক্তি। ‘প্রাণেন্নেব প্রাণো নাম ভবতি।’^{৪৭} নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসরূপে প্রাণক্রিয়াকে ‘প্রাণ’ নামেই অভিহিত করা হয়। সমগ্র বিশ্বের জীবন-তত্ত্বের প্রধান বিষয় হলো বায়ু, ঠিক তেমনি মানুষের জীবনের প্রধান বিষয় হল প্রাণ। যেভাবে রথের চাকার নাভিতে শলাকাগুলি যুক্ত হয়ে থাকে, সেইভাবে প্রাণের মধ্যেই সমগ্র জগৎ প্রবিষ্ট হয়ে রয়েছে।^{৪৮} কৌষীতকি উপনিষদেও একথার সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন রথের চাকার বেড়ি শলাকাগুলিতে প্রবিষ্ট, আবার শলাকাগুলি চাকার কেন্দ্রে প্রবিষ্ট, তেমনি এই ভূতমাত্রাগুলি প্রজ্ঞামাত্রায় প্রবিষ্ট। প্রজ্ঞামাত্রাগুলি প্রাণে প্রবিষ্ট। এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা।^{৪৯} জগতের যাবতীয় জিনিষ এই প্রাণশক্তির অন্তর্নিহিত। উপনিষদ তাই বলেছেন, এমন প্রাণই পিতা, মাতা, ভাই, বোন, আচার্য, ব্রাহ্মণ।^{৫০} প্রাণ হল সর্বাঙ্গিক। ক্রিয়া, কারক, ফল—এই সমস্তই প্রাণ। সবকিছুর কেন্দ্রে একমাত্র প্রাণই রয়েছে। যেভাবে গাড়িকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে গেলে ঘোড়াকে সঙ্গে যুক্ত করা হয়; সেইভাবে রথস্থানীয় শরীরে প্রাণযুক্ত হয়ে রয়েছে। এখানে ঘোড়া হলো বল ও শক্তির প্রতীক। একইভাবে শরীরেও শক্তি ও বল রয়েছে। প্রাণের শক্তির দ্বারাই শরীর গতিযুক্ত হয়।^{৫১}

প্রাণের নিবাসস্থান এই শরীর। শরীর প্রাণের দ্বারাই রক্ষা পায়। জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। ভারতভূমি আমাদের জীবনধারণের উপকরণ প্রদান করে। প্রাণশক্তি, জীবন সত্তা, অস্তিত্বের বিকাশের মূল ভিত্তি এই ভারতভূমি। ভারতমাতার প্রাণস্বরূপিণী শক্তিতেই সমগ্র ভারতবাসী প্রাণবন্ত, কর্মক্ষম ও ঐক্যবদ্ধ থাকেন। প্রাণ না থাকলে যেমন শরীরের আর অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি ঋষি বঙ্কিমের দৃষ্টিতে ভারতাত্মা জননী দেশমাতৃকা-প্রসূত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলে জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন হয় না। তাই প্রাণশক্তিরূপিণী, জীবনের চৈতন্যরূপিণী ভারতমাতার বন্দনা করা ভারতসন্তানদের অবশ্য কর্তব্য।

দেশমাতৃকা হলেন ভক্তিস্বরূপিণী। ‘ভজ্ সেবায়াম্’ ধাতুর দ্বারা ‘জিয়াং জিন্’^{৫২} এই সূত্রানুসারে ‘জিন্’ প্রত্যয় দ্বারা ভক্তি শব্দ নিষ্পন্ন হয়। আসলে ‘জিন্’ প্রত্যয়ের ভাবরূপে অর্থ হলো— ‘ভজনং ভক্তি’। কিন্তু বৈয়াকরণরা এখানে কৃদন্ত প্রত্যয়ের অর্থ করেছেন, পরিবর্তিত অর্থ। অতএব, সেই জিন্ প্রত্যয় অর্থাৎ প্রযুক্ত হতে পারে। ‘ভজনং ভক্তিঃ’, ‘ভজ্যতে অনয়া ইতি ভক্তিঃ’, ‘ভজন্তি অনয়া ইতি ভক্তিঃ’ ইত্যাদি ‘ভক্তি’ শব্দ-এর ব্যুৎপত্তি হতে পারে। এক্ষেত্রে জিন্ প্রত্যয়ের অর্থ ‘প্রেম’ পর্যায়বাচী। ভক্তি অথবা ভজন শব্দ ক্রমশ ‘জিন্’ ও ‘লুট্’ প্রত্যয়ের দ্বারা সম্পন্ন হলে অর্থ হবে, সেবায় নিষ্ঠা লাভ করাই ভক্তি। অতএব, ভক্তি শব্দের বাস্তবিক অর্থ হলো সেবা। গুরুপূরাণে বলা হয়েছে, ‘তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী।’^{৫৩} তাই বলা যায়, সেবাই ভক্তির প্রধান সাধন। ভগবানে চিন্তকে স্থির করাই ভক্তি।^{৫৪} চিন্তের স্বভাব হলো কোনো লৌকিক অথবা অলৌকিক বস্তুর দর্শন, শ্রবণ ও মনন দ্বারা তার আকারতা লাভ করা। ভক্তিরসায়নে তাই বলা হয়েছে—‘চিন্তে দ্রুতে প্রবিষ্টা যা গোবিন্দাকারতা স্থিরা সা ভক্তিরিত্যভিহিতা।’^{৫৫} অর্থাৎ চিত্ত দ্রবীভূত হয়ে যখন গোবিন্দের আকারে স্থিতি লাভ করে, তাই-ই

ভক্তি। শাস্ত্রের নিরিখে ভক্তি যেভাবে ঈশ্বরের প্রতি অনন্য প্রেম ও আত্মসমর্পণ, একইভাবে মাতৃভূমি ভারতবর্ষের প্রতি সমগ্র ভারতবাসীর সেবা, ত্যাগ, আত্মবলিদান ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা। ঋষি বঙ্কিমের মননে ভারতমাতা দেবীরূপে বন্দিতা। সেই দেবীর প্রতি আত্মনিবেদনের আহ্বান জানিয়েছেন ঋষি বঙ্কিম। দেশমাতৃকাই ‘ভক্তি’রূপে সকলের হৃদয়ে প্রকাশিত হন। বঙ্কিম তাই রাষ্ট্রের নৈতিক মূল্যবোধের সেবায় আত্মোৎসর্গের এই জাগরণ মন্ত্রে সমগ্র ভারতবাসীকে পুনর্জাগরণের চিরন্তন আহ্বান করেছেন।

দুর্গা-লক্ষ্মী-সরস্বতী—ত্রিশক্তি-সমন্বিত ভারতমাতা

‘বন্দে মাতরম্’ সঙ্গীতের পঞ্চম স্তবকটি হলো—

‘ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণ-ধারিণী,
কমলা কমল-দল-বিহারিণী,
বাণী বিদ্যাদায়িনী,
নমামি ত্বাং।

নমামি কমলাম্ অমলাম্ অতুলাং,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্,
বন্দে মাতরম্।’

ভারতমাতা দুর্গারূপে পূজিতা। তিনিই দশপ্রহরণধারিণী। দেবী দুর্গা হলেন আদ্যাশক্তি মহাপ্রকৃতিরই একটি রূপ। সেই সূত্রে তিনি সচ্চিদানন্দরূপিণী, জ্যোতির্ময়ী, চিন্ময়ী মা পরা প্রকৃতি। পরম করুণাময়ী মা বিশ্বজননী। মা হচ্ছেন সন্তানের অভয় আশ্রয়। বাৎসল্য ও কারুণ্যের ঘনীভূত মূর্তি। মাতৃরূপে সেই দুর্গা সর্বশক্তিস্বরূপা ও সর্বার্থদায়িনী।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ দুর্গা নামের আক্ষরিক নিরুপস্থিতি করেছেন। সেখানে আমরা দেখি দুর্গা শব্দ বিচ্ছেদ করলে পাঁচটি অক্ষর পাওয়া যায়—দ + উ + র্ + গ্ + আ। এর মধ্যে দ্-এর অর্থ দৈত্যনাশ। আর দৈত্য শব্দের অন্তরালে আছে আমাদেরই ছাঁচ রিপু। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্গ। উ শব্দের অর্থ জীবের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই তিনটি তাপ নাশ করে পালন করাকে বোঝায়। র্-এর দ্বারা কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই তিনরকম রোগের নাশ সূচিত হয়ে থাকে। আর গ্-কারের দ্বারা জীবের পাপের বিনাশকে বোঝায়। আ হচ্ছে ভয় ও শত্রু-হত্ববাচক। সুতরাং ‘দুর্গা’ শব্দের অর্থ দাঁড়াল—যিনি জীবের কাম, ক্রোধ প্রভৃতি রিপু ধ্বংস করেন, ত্রিতাপ হরণ করেন, ত্রিতাপ নাশ করেন, রোগ, শোক ও দুঃখ দূর করেন।

পাঁচটি অক্ষর নিয়ে তৈরি এই দুর্গা নামের আর একটি সুস্পষ্টতত্ত্ব আছে। আকাশ, বাতাস, আগুন, জল, মাটি দিয়ে গড়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়—সবটাই পঞ্চভূতেরই আসা, যাওয়া ও থাকা। এছাড়া জগতের আর কোনো উপাদান নেই। পঞ্চভূত কিন্তু ঈশ্বরের আত্মশক্তি থেকে উৎপন্ন হয়, তারপর তাঁকে আশ্রয় করেই অবস্থান করে। ঐ ঈশ্বরশক্তিই হচ্ছেন জীবের জীবাত্মা। ফলত দেখা যাচ্ছে যে, যে আত্মশক্তি থেকে এই পঞ্চভূতের উৎপত্তি, যিনি এই ভূতপঞ্চকের অধিষ্ঠাত্রী, প্রেরয়িত্রী এবং পঞ্চভূতময়ী, আত্মশক্তিস্বরূপা সেই মূল

প্রকৃতিই হচ্ছেন দুর্গা। সব প্রাণীই তাদের চোখ, কান, নাক, রসনা, ত্বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্য নিয়ে যা উপলব্ধি করতে পারে, তিনি হলেন দুর্গা। তেমনি বাক্, পাদ, পাণি, পায়ু, উপস্থ—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের সাহায্যে সব প্রাণীই যা কিছু করে তারও উৎস হলেন দুর্গা। শাস্ত্র বলেছেন, জীবের সব ইন্দ্রিয়ই ওই আত্মশক্তিকে আশ্রয় করে উৎপন্ন হয়, অবস্থান করে আর তার দ্বারা সব বিষয়-উন্মুখতা লাভ করে। এই শক্তিই দুর্গা। তিনি সর্বময়ী, সর্বব্যাপ্তা বা ব্যাপ্ত এবং অব্যাক্তরূপে সর্বত্র বিরাজমান।

রামায়ণে ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে^{৫৬} দেবী দুর্গার শস্যধিষ্ঠাত্রী রূপটি ফুটে ওঠে। অবশ্য কৌটিল্য তাঁর গ্রন্থে দুর্গের মধ্যে যে সকল দেবতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার নির্দেশ দিয়েছেন তাঁদের অন্যতম হলেন অপরাজিতা।^{৫৭} অনেকে মনে করেন, এই অপরাজিতাই মা দুর্গা। স্কন্দপুরাণেও দেখা যায়, মহাদেব কাশী রক্ষা করার জন্য নন্দীকে প্রতি দুর্গে দুর্গাপ্রতিমা প্রতিষ্ঠা করতে আদেশ দিয়েছিলেন—‘প্রতি দুর্গং দুর্গারূপাঃ পরিতঃ পরিবাসয়।’^{৫৮} মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবীকে শাকম্ভরী বলে উল্লেখ করা হয়েছে।^{৫৯} দেবীমাহাত্ম্যে^{৬০} অবশ্য এর কারণের কিছুটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন—সেখানে বলা হয়েছে, বঙ্গদেশে প্রতি বছর শরৎকালে শস্যের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে শাকম্ভরী দেবীর অর্চনা করা হতো। এই শাকম্ভরী আবার পৃথিবীর বা ধরিত্রীরও অপর নাম। মাটি খোঁড়ার সময় পৃথিবীর গর্ভ থেকে জনকনন্দিনী সীতার জন্ম হয়েছিল বলে সীতাকেও ধরিত্রীদেবী বা শস্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলা হয়। এই পৃথিবীই দেবী দুর্গা, কারণ সমগ্র সৃষ্ট জীবকে তিনি বক্ষে ধারণ করেন এবং শস্য বিতরণ করে প্রাণীদের জীবন রক্ষা করেন। সূর্য যেমন বিশ্বের প্রাণ ধারণের কারণ, কেননা সূর্য তাপ বিকিরণ না করলে পৃথিবী ঠাণ্ডায় বরফে পরিণত হতো অথবা বৃষ্টির অভাবে উত্তপ্ত মরুভূমিতে পরিণত হতো। ঠিক তেমনি দেবী দুর্গাও হচ্ছেন বিশ্বজননী। তিনি প্রাণরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখেন এবং তাদের দুর্গতি বা দুঃখ-কষ্ট থেকে রক্ষা করেন। এই দুর্গাদেবীই অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণা।

দেবী আদ্যাশক্তি মহামায়া দুর্গা নামেই বেশি পরিচিত। দুর্গা শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে একটি অর্থ হলো দুঃখ বা দুর্গতি নাশ করেন যিনি—‘দুর্গাসি দুর্গভবসাগরনৌরসঙ্গা।’^{৬১} কারণ এই দুর্গাই সংসাররূপ সাগর পারাপারের একমাত্র তরণী। এই দেবী দুর্গাই মহিষাসুরমর্দিনী, ত্রিনয়না, জটাসমন্বিতা। আর তাঁর সেই জটায় চন্দ্রকলা শোভা পায় অপরূপ রূপে। মায়ের গাত্রবর্ণ অতসী ফুলের মতো এবং তাঁর চোখগুলি নীলোৎপলের মতো। তাঁর দশটি হাতে দশটি অস্ত্র। অসুর বিনাশের জন্য দেবতারাই তাঁকে সেই অস্ত্র দান করেছেন। তাঁর ডানদিকের হাতগুলিতে ত্রিশূল, খঙ্গা, শক্তায়ুধ, চক্র এবং একটি জ্যা-রোপিত ধনুক। এবং বাম হাতগুলিতে নাগপাশ, অঙ্কুশ, খেটক, পরশু ও ঘণ্টা। দেবী দুর্গা তাঁর দশভুজে দশ প্রহরণে সমন্বিতা। যে দশটি অস্ত্রের দ্বারা দেবী মানবের আন্তর অসুররূপ অজ্ঞান, অহংকার, অধর্ম, অন্যায়, অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে নৈতিকতা, সংযম, একাগ্রতা, সাহস, স্থৈর্য, শৃঙ্খলা ও দৃঢ়তার সম্পদে পূর্ণ করেন।

বঙ্কিমের মননে ভারতমাতাও সমগ্র জাতির অশুভের বিনাশ ঘটিয়ে জাতিকে নৈতিকতায় সমৃদ্ধ করেন। অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ়তায় ভারতবাসীকে সম্ববদ্ধ হতে শেখান। ভারতমাতা এইভাবে সমগ্র ভারতবাসীকে নিভীকতা, চিন্তাশক্তি, আত্মজ্ঞান সাধনে দৃঢ় নিষ্ঠা, দান ও বাইরের ইন্দ্রিয়ের সংযম, যজ্ঞ, বেদপাঠ, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্যবাদিতা, ক্রোধহীনতা, ত্যাগ, শাস্তি, ভূতসমূহে দয়া, লোভশূন্যতা, মৃদুতা, আচাঞ্চল্য, ক্ষমা, ধৈর্য, শুচিতা, নিরভিমানতা রূপ দৈবীসম্পদে ঋদ্ধ করেন। এই সাংস্কৃতিক গুণাবলীই ভবিষ্যৎ জাতির শুভ ও কল্যাণের প্রতীক। দুর্গারূপিণী ভারতমাতা তাই দশপ্রহরণধারিণী।

বাণীরূপিণী বিদ্যাদায়িনী। অর্থাৎ দেবী সরস্বতীর স্বরূপেও তিনি বিরাজমানা। নিরুক্তকার যাক্ষ দেবী সরস্বতীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—‘দেবীরূপা নদীরূপা চ’ অর্থাৎ ইনি দেবীরূপে এবং নদীরূপেও পরিচিতা। বাগ্‌দেবী সরস্বতী তাই পরবর্তী সময়ে জলদায়িনী নদীরূপেও সম্মান লাভ করেছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে অতুল ঋষির বিদূষী কন্যা ছিলেন বাক্ আর সেই বাক্ বিদ্যারূপিণী দেবীই সরস্বতী নামে পরিচিত হয়েছেন। সরস্বতী জ্ঞানদাত্রী, বিদ্যা ও বুদ্ধিদাত্রী ও সৃষ্টিশক্তি। জ্ঞানরূপা ও পরমার্থদায়িনী। যোগবশিষ্ঠে বলেছেন, পরমাত্মার স্পন্দনশক্তি থেকে যখন নাম-রূপাদি সব কিছু সৃষ্টি হয়, তখন তাঁকে বলে সরস্বতী।^{৬২}

বাক্‌স্বরূপা সরস্বতীর অন্য নাম রয়েছে। তিনি বাণী, শব্দকারিণী শক্তি। বেদ ও সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার শক্তি। বিশ্বকর্মা বাক্‌শক্তিকে আশ্রয় করে প্রজাসমূহ সৃষ্টি করেন। প্রজাপতিই বাক্‌স্বরূপা সরস্বতীর পতি।^{৬৩} প্রজাপতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ বস্তু তাই বাক্। এই বাক্‌শক্তিই হলেন সারদা। দেশমাতৃকা।

ভারতমাতাকে জ্ঞানদাত্রীরূপে বঙ্কিমচন্দ্র বিভূষিত করেছেন। কারণ তিনি শব্দস্বরূপা এবং শব্দসমৃদ্ধতা। আর ভারতেই বেদের মন্ত্র, উপনিষদের আত্মতত্ত্ব, নানা দর্শন সম্প্রদায়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ভাগবত পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদ ইত্যাদির বিকাশলাভ ঘটেছে। ভারতমাতা তাই জ্ঞান ও শিক্ষার ভূমি। সাহিত্য ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। ভারতমাতা বর্ণাশ্রমিক ভাষারূপে সমগ্র জাতির চিন্তার বিকাশ ঘটান। জাতির অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা ও সৃজনী শক্তিকে ন্যায্য ও মূল্যবোধের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করে। বিদ্যাদায়িনী ভারতমাতা তাই সরস্বতীরূপে যুগযুগান্তরে বন্দিতা।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মননে সূজলা সুফলা ভারতমাতা আবার কমলা রূপেও আরাধিতা। বৈদিক সাহিত্যে লক্ষ্মী সৌভাগ্যদায়িনী ও ঋদ্ধিদায়িনী। জগৎকর্তা বিষ্ণুর পত্নী বা পালিকা শক্তিরূপে লক্ষ্মী দেবী ভূষিতা। তিনি গৌরবর্ণা, সর্বালঙ্কার-সমম্বিতা, সুরূপা ও পদ্মের ওপর অবস্থিত। তিনি দুই হাতের মধ্যে দক্ষিণ হস্তে বর ও বাম হস্তে ঐশ্বর্য ও শ্রীর প্রতীক সুবর্ণ-কমল ধারণ করে আছেন। তাঁর একপাশে অক্ষমালা ও অপর পাশে অঙ্কুর রয়েছে। তিনি চন্দ্র ও সূর্যের মতো প্রভাযুক্ত। তাঁর অপর নাম শ্রী। তিনি দারিদ্র্যানাশিনী, ধন-সম্পদদায়িনী। ‘শ্রী’ শব্দের অনেক মানে। যেমন—ধন-ধান্য, শস্য, পশু, প্রজা, ভূতা, পরিজন, গৃহশোভা, লাভণ্য, রূপ, তৃপ্তি, পুষ্টি, আয়ু, কীর্তি, বুদ্ধি, যশ, ধর্মপ্রতিষ্ঠা। সুখ, শাস্তি, বিদ্যা, জ্ঞান,

বৈরাগ্য এবং ধর্ম, অর্থ, কাম—লক্ষ্মী এই সবই দিয়ে থাকেন।

ভারতবাসীর দৈনন্দিন জীবনে ও ধর্মাচরণের জন্য জাগতিক বস্তুর দরকার হয়। গ্রাসাচ্ছাদন সকলেরই প্রয়োজন। মঠ, মন্দির, ধর্ম, কর্ম, দান, যজ্ঞ, পূজা, ব্রত, আত্মের সেবা, তীর্থে ভ্রমণ, শাস্ত্রাদি পাঠ, ইষ্টপূর্তাদি কর্ম সবকিছুতেই মা লক্ষ্মীর কৃপা প্রয়োজন। লেখাপড়া করতে গেলেও প্রয়োজন। ধন হলো মানুষের বাহ্য প্রাণ। বায়ুপুরাণ বলেছেন, যে যার ধন হরণ করে সে তার প্রাণই হরণ করে। পরের ধন হরণ করা তাই নরহত্যার মতো পাপ। ধন প্রাণস্বরূপ বলেই ধন নাশ হলে মানুষ শোকে আকুল হয়ে যায়।^{৬৪} মহাভারতকার বলেছেন, রাজ্য যাতে ধ্বংস না হয়, তাই ধন সংগ্রহ করে রাখতে হয়। দুর্ভিক্ষের সময়, অসুস্থতার সময় ধন দরকার হয়। বৃদ্ধ বয়সে জীবন-নির্বাহের জন্য ধন অত্যন্ত দরকারী। সাহস ও অমর্যপূর্ণ শত্রুদের প্রতিকারের জন্য ধন প্রয়োজন। বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্যও ধন লাগে। তাই নিজের ধন নিজের কাছে রক্ষা করতে হয়।^{৬৫} লক্ষ্মী এই ধনের দেবতা। তিনি বিষ্ণুপত্নী। পালিনী শক্তি। ঐশ্বর্যরূপিণী হলেন দেবী লক্ষ্মী।

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে লক্ষ্মীস্বরূপা ভারতমাতা ভূমি, নদী, জলাশয়, গাছপালা, শিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য, কৃষি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ঐশ্বর্যে আমাদের নিয়ত পুষ্ট করে চলেছেন। বেদের শ্রীসূক্তেও এর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে, শ্রীদেবী সর্বভূতের অধিষ্ঠাত্রী, সর্বদা পুষ্টিদায়িনী, সমৃদ্ধিদাত্রী ও কল্যাণময়ী। ভারতমাতা ঐশ্বর্য, শ্রী, সমৃদ্ধির দেবীরূপে স্বীকৃত ও সমালঙ্কৃত। পদ্মাসনে আসীনা দেবী লক্ষ্মী মানুষের আন্তর ও বাহ্য সন্তাপ দূর করে শাস্তি ও পরম তৃপ্তি প্রদান করেন। ভারতমাতাও তেমনি অন্ন, জল, বাসস্থান ইত্যাদি সবকিছু দিয়ে তার সন্তানদের নিয়ত পুষ্ট করে চলেছেন। ভারতমাতাকে বঙ্কিম তাই লক্ষ্মীরূপা বলে বন্দনা করেছেন—

‘শ্যামলাং সরলাং সুমিত্রাং ভূষিতাং
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।’

নির্ণয়

বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক পটভূমিতে বিচার করলে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘বন্দে মাতরম্’ কোনো বিচ্ছিন্ন সাহিত্যকীর্তি বলে মনে হয় না। বরং এটি এক প্রাচীন সভ্যতাগত অন্তর্দৃষ্টির আধুনিক প্রকাশ। এই সঙ্গীতের অন্তর্নিহিত মাতৃমূর্তি একইসঙ্গে উর্বর ভূমি, সমৃদ্ধির উৎস, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের আধার এবং দিব্য নারীত্বের এক প্রতিভূ। ভারতীয় সভ্যতায় আধ্যাত্মিকতার পরিসরে মাতৃরূপে চিত্রিতা ভারতমাতার প্রতি অকৃত্রিম প্রেম, ভক্তি ও আত্মনিবেদন, কৃতজ্ঞতা, কর্তব্যবোধ এবং সমষ্টিগত শ্রদ্ধার আন্তরিক নিবেদন ঘটেছে এই সঙ্গীতের পরতে পরতে। বঙ্কিমচন্দ্র মহাজাগতিক শক্তিরূপিণী ভারতমাতাকে সমগ্র সৃষ্টির অন্তর্নিহিত চেতনা, শক্তি ও অস্তিত্বের মূল ক্ষেত্র বলে অভিহিত করেছেন। ভারতবাসীর জীবনযাপন, জীবন ধারণ, লালনপালনে সদা ব্রতী এই ভারতমাতা। দেবীসুজ্ঞের সর্বব্যাপী মাতৃশক্তির ধারণাই পরবর্তীকালের শান্ত মতে মহামায়া, আদ্যাশক্তি ও জগজ্জননী রূপে বিকাশিত হন। ‘বন্দে মাতরম্’-এ সেই ঐতিহ্য নতুন ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে। ভারতভূমি তাই

কোনো একটি জড় ভূখণ্ড বা সাধারণ কোনো দেশমাত্র নয়। চিন্ময়ী মহাশক্তিই এক বিশেষ প্রকাশ হলেন ভারতমাতা। ‘বন্দে মাতরম্’-এর তাত্ত্বিক দর্শনে বৈদিক মাতৃভাবনার পাশাপাশি পৌরাণিক দেবীমাহাত্ম্যও প্রকাশিত হয়েছে। পৌরাণিক অম্বিকা, দুর্গা, চণ্ডিকা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও মহামায়ারূপিণী দেবীমূর্তিই বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতমাতারূপে উদ্ভাসিত। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের এই মাতৃমূর্তি কোনো একক দেবীর সীমায় আবদ্ধ নন। তিনি একইসঙ্গে শক্তি, বিদ্যা, সমৃদ্ধি ও ধর্মের আধারস্বরূপা। তিনি একদিকে যেমন করুণাময়ী জননী, আবার তিনি অধর্মবিনাশিনী শক্তিও। ন্যায় ও ধর্মরক্ষার জন্য সর্বদা অস্ত্রধারণ করে আছেন। তিনি সজ্জনের গৃহে শ্রী, জ্ঞানীর মধ্যে বুদ্ধি, ধার্মিকদের মধ্যে শ্রদ্ধা এবং মহৎ মানুষের মধ্যে বিনয়রূপে বিরাজমান। এই মাতৃভূমি ভারত তাই জীবনদায়িনী পোষণকারিণী জননী।

বঙ্কিমচন্দ্রের ‘বন্দে মাতরম্’ সঙ্গীতে যে আদর্শে মাতৃবন্দনা হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ সেই আদর্শকে জীবন্ত কর্মসূচিতে পরিণত করলেন। তিনি মনে করেছিলেন, ‘বন্দে মাতরম্’ সঙ্গীতকে শুধুই উচ্চারণের মধ্যে সীমায়িত করা নয়, বরং মাতৃভূমির সেবার জন্য নিজেদের শক্তিমান্ন করে তোলা। মাতৃভূমিকে দুর্গারূপে কল্পনা করা হলে তাঁর সন্তানদেরও দুর্বল, জড় ও ভীরু হয়ে থাকা চলে না। তাদের মধ্যেও সেই শক্তি, ক্ষাত্রবীর্য, কর্মস্পৃহা জাগরণের প্রয়োজন। এই কারণেই স্বামীজীর দেশপ্রেম ছিল নিছক আবেগের নয়, তা ছিল সাধনা, তপস্যা ও কর্মের আহ্বান। স্বামীজী অনুভব করেন, ভারতমাতার পূজা কেবল মন্দিরে নয়, মানুষের মধ্যেই করতে হবে। তাই জগদ্বাসীর কাছে মাতৃভূমিই আরাধ্যা দেবী হন। বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃভূমিকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বামীজী সেই দেবীকে কীভাবে দরিত্রের সেবা, অশিক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, আত্মবিশ্বাসের জাগরণ এবং জাতীয় চরিত্র গঠনের মাধ্যমে পূজা করতে হয় তা শেখালেন। তাঁর কাছে দেশসেবা ও ঈশ্বরসেবা অভিন্ন হয়ে উঠেছিল। তাই এই সঙ্গীত শুধু শব্দে সীমাবদ্ধ রইল না, বিবেকানন্দের বাণীতে তা পরিণত হলো জাতীয় শক্তি, আত্মমর্যাদা ও কর্মযোগের সম্মিলিত এক মন্ত্র। যা স্বাধীনতা আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাসে ভারতবাসীর মনে প্রেরণার উৎসরূপে কাজ করেছে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় ‘বন্দে মাতরম্’ এই চেতনাকে জাতীয় জাগরণের শক্তিতে রূপান্তরিত করে। শ্রীঅরবিন্দের ভবানী ভারতীতে ভারতমাতা জাগ্রত শক্তির রূপ ধারণ করেন, যিনি তাঁর সন্তানদের আত্মশক্তি, ত্যাগ ও কর্মের পথে আহ্বান জানান। আর বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতমাতা, বিবেকানন্দের জাগ্রত ভারত এবং শ্রীঅরবিন্দের ভবানী ভারতী—সবকিছুতেই প্রকাশ পায় একই মূল উপলব্ধি—এই ভূমি জীবন, সংস্কৃতি ও চেতনার আধার। এই কারণে ‘বন্দে মাতরম্’ নিছক একটি গান নয়; এটি একটি সভ্যতার আত্মস্মৃতি, যেখানে মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা মানুষের নিজের উচ্চতর মানবিক ও আধ্যাত্মিক সত্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

তথ্যসূত্র

১। তৈত্তিরীয় উপনিষদ, শীক্ষাবল্লী, অনুবাক্-১১।

- ২। ‘মাতা ভূমিঃ পুত্রোহং পৃথিব্যাঃ।’—অথর্ববেদসংহিতা, দ্বাদশ কাণ্ড, ভূমিসূক্ত, ১২।
- ৩। ‘সত্যং বৃহদৃতমুগ্রং দীক্ষা তপো ব্রহ্মযজ্ঞঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তি। সা নো ভূতস্য ভব্যস্য পত্ন্যরুং লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু।।’
—ঐ, ১।
- ৪। ‘নানাবীৰ্যা ওষধীৰ্যা বিভর্তি পৃথিবী নঃ প্রথতাং রাধ্যতাং নঃ।।’
—ঐ, ২।
- ৫। ‘বিশ্বন্তরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী। বৈশ্বানরং বিভর্তী ভূমিরগ্নিমিত্রশ্বভা দ্রবিণে নো দধাতু।।’
—ঐ, ৬।
- ৬। ‘ততোহহমখিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবঃ।
ভরিষ্যামি সুরাঃ শাকৈরাবৃষ্টেঃ প্রাণধারকৈঃ।।
শাকন্তরীতি বিখ্যাতিং তদা যাস্যামহং ভূবি।’
—মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবীমাহাত্ম্য।
- ৭। ‘একস্যাং মুষ্ঠৌ বাণান্, একস্মিন্ হস্তে কমলম্, একস্মিন্ হস্তে পুষ্পাদিকম্, একস্মিন্ ধনর্বিভর্তি ইত্যর্থঃ। দক্ষাধো হস্তাদিবামাধোহ-
স্তপর্যন্তম্ আয়ুর্ধ্যানম্।’—দেবীভাগবত, ৭.২৮.৩৫—৩৬, শৈবনীলকণ্ঠ টীকা।
- ৮। ‘যাং রক্ষন্ত্যস্বপ্না বিশ্বদানীং দেবা ভূমিং পৃথিবীমপ্রমাদম্।
সা নো মধু প্রিয়ং দুহামথো উক্ষতু বর্চসা।।’
—অথর্ববেদসংহিতা, দ্বাদশ কাণ্ড, ভূমিসূক্ত, ৭।
- ৯। ‘সা নো ভূমিস্ত্রিষিং বলম্ রাষ্ট্রে দধাতুত্তমে।।’—ঐ, ৮।
- ১০। ‘সা নো ভূমির্ভূরিধারা পয়ো দুহামথো উক্ষতু বর্চসা।।’
—ঐ, ৯।
- ১১। ‘রাত্রী ব্যাখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যহক্ষভিঃ।
বিশ্বা অধিশ্রিয়োহধিত।।’
—ঋগ্বেদসংহিতা, দশম মণ্ডল, রাত্রিসূক্ত, ১।
- ১২। নিরুক্ত দ্রষ্টব্য।
- ১৩। ‘ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো দেব্যুদতঃ। জ্যোতিষা বাধতে তমঃ’
—ঋগ্বেদসংহিতা, ১০, ১২৭, ২।
- ১৪। ‘প্রসীদা ভগবত্যশ্বে প্রসীদ ভক্তবৎসলে।
প্রসীদ সর্বভূতেশি দেবি ত্রাহি জগদন্মিকে।।’
—মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবী মাহাত্ম্য।
- ১৫। ‘অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাং।
তাং মা দেবা বাদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্।।’
—দেবীসূক্ত, ৩।
- ১৬। ‘অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যোতাবতী মহিনা সংবভূব।।—ঐ, ৮।
- ১৭। তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২.৭।
- ১৮। ‘যতোহভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ।’—বৈশেষিক সূত্র, ১.১।
- ১৯। ‘চোদনালক্ষণোহর্থো ধর্মঃ।’—মীমাংসাসূত্র, ১.২।
- ২০। ‘ধর্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা।’—তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১.১১.১।
- ২১। অর্থশাস্ত্র, বিনয়াদিকারিক দ্রষ্টব্য।
- ২২। শুক্রনীতি দ্রষ্টব্য।
- ২৩। ন্যায়সূত্র, বাৎসায়নভাষ্য দ্রষ্টব্য।
- ২৪। মহাভারত, শান্তিপর্ব দ্রষ্টব্য।
- ২৫। ‘সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।’

—শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ১৮.৬৬।

২৬। স্বাধ্বেদ, ১০.১৯১.২।

২৭। ‘সমানী ব আকৃতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।

সমানমস্ত্র বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি।।’—ঐ, ৪।

২৮। ‘তেজোহসি তেজো ময়ি ধেহি।

বীৰ্যমসি বীৰ্য ময়ি ধেহি।

বলমসি বলং ময়ি ধেহি।

ওজোহসি ওজো ময়ি ধেহি।’

—কৃষ্ণযজুৰ্বেদ, তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ৪.৪২।

২৯। ‘অভিবর্তেন ভগিনা যেনেন্দ্রো অভিবাবুধে।

তেনাস্মান্ ব্রহ্মণস্পতেহভি রাষ্ট্রায় বর্ধয়।।’—রাষ্ট্রাভিবর্ধন সূক্ত, ১।

৩০। ‘যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।’—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৫.৩৪।

৩১। ঐ, প্রণবপ্রেমামৃত ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

৩২। ‘বিমর্শো নাম বিশ্বকারেণ বিশ্বপ্রকাশেন বিশ্বসংহরণেন চ
অকৃত্রিমাহমিতি স্ফুরণম্।’—পর্যাপ্রবেশিকা দ্রষ্টব্য।

৩৩। ‘যং কাময়ে তং তমুথং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমুখিং তং
সুমেধাম্।’—দেবীসূক্ত, ৫।

৩৪। ‘দেবি প্রপন্নাত্বহরে প্রসীদ প্রসীদ মাতর্জগতোহখিলস্য।

প্রসীদ বিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বং ত্রীমীশ্বরী দেবি চরাচরস্য।’

—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১.৩।

৩৫। ‘পরাস্য শক্তিবিবীধৈব শ্রয়তে।

স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া।’—শ্বেতাস্বতর উপনিষদ, ৬.৮।

৩৬। তৈত্তিরীয় উপনিষদ, শাস্তিমন্ত্র।

৩৭। ‘অদ্বৈস্তা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।’

—শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ১২.১৩।

৩৮। ‘বিদ্যাঃ সমস্তান্তব দেবি.....।’—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১.৬।

৩৯। ‘অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারঃ মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।

পুরাণং ধর্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাছ্যোতাশ্চতুর্দশ।।

আয়ুর্বেদো ধনুর্বেদো গন্ধর্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।

অর্থশাস্ত্রং চতুর্থং বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তু।।’—তত্ত্বপ্রকাশিকা দ্রষ্টব্য।

৪০। ‘যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে।

আত্মবিদ্যা চ দেবি ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনী।।

আত্মক্ষিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিস্বমেব চ।।’—বিষ্ণুপুরাণ দ্রষ্টব্য।

৪১। ‘সর্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতো।’—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১১.৮।

৪২। ‘সৃষ্টিকর্ত্রী চ প্রকৃতিঃ সর্বেষাং জননী পরা।

মম তুল্যা চ মনয়া তেন নারায়ণী স্মৃতা।।’

—ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, গণেশ খণ্ড, ৭।

৪৩। ‘দ্বৈ বিদ্যো বেদিতব্যো.... পরা চৈবাপরা চ।’

—মুণ্ডকোপনিষদ, ১.১.৪।

৪৪। ‘ধারণাক্রমমিত্যর্হর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।

যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।।’

—মহাভারত, কর্ণপর্ব, ৬৯.৫৮।

৪৫। ‘যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্য ভিধীয়তে।’

—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ৫.১৯।

৪৬। ঐ, প্রণবপ্রেমামৃত ভাষ্য।

৪৭। ‘সর্বপ্রকারচেষ্টাব্যাগুণগুণপ্রদর্শনার্থম্। অন ইতি প্রাণস্য প্রত্যক্ষং

নাম।’—ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৫.২.১, শাক্করভাষ্য।

৪৮। ‘প্রাণে সর্বং সমর্পিতম্।’—ঐ, ৭.১৫.১।

৪৯। ‘প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা।’—কৌষীতকি উপনিষদ, ৩.৮।

৫০। ‘প্রাণো পিতা, প্রাণো মাতা প্রাণো ভ্রাতা....।’

—ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৭.১৫.১।

৫১। ‘শরীরে প্রাণা যুক্তঃ।’—ঐ, ৮.১২.৩।

৫২। অষ্টাধ্যায়ী, ৩.৩.৯৪।

৫৩। গরুড়পুরাণ, ২১৯.৩।

৫৪। কল্যাণ পত্রিকা, ভক্তি অঙ্ক, পৃষ্ঠা—৩৬২।

৫৫। ভক্তিরসায়ন, ২.১।

৫৬। কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র, ২.৪.৩।

৫৭। ঐ, ২.৪.৫।

৫৮। স্কন্দপুরাণ, কাশীখণ্ড, উত্তরার্ধ, ৬৯.১৭৮।

৫৯। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৯১. ৪৫।

৬০। দেবীমাহাত্ম্য, ৯২.১১।

৬১। দুর্গাসপ্তশতী, ৪।১১।

৬২। ‘সরস্বতী সৃষ্টিশক্তিরূপা আদ্যা প্রকৃতি।

সরণাং সর্বসৃষ্টীনাং কথিতেষা সরস্বতী।।’—যোগবাসিস্ত দ্রষ্টব্য।

৬৩। ‘প্রজাপতি বৈ বাচস্পতিঃ।’—শতপথব্রাহ্মণ, ৫.১.১.১৬।

৬৪। ‘যদেতদ্রবিণং নাম প্রাণ হ্যেতে বহিঃচরাঃ।

স তস্য হরতি প্রাণান্ যেষ্য হরতে ধনম্।।’—বায়ুপুরাণ দ্রষ্টব্য।

৬৫। মহাভারত, শান্তিপর্ব দ্রষ্টব্য।

*With Best Compli-
ments from -*

A

Well Wisher

KN

Durga Puja Festival Greetings
to
All Our Customers, Patrons
and Well Wishers.

MAZZA DENIM

Incense Sticks

Now you can capture the beauty of
an experience light-up and unfold a
thousand petals.

Shashi Industries
Bhabnagar - 364 001
Bangalore - 560 010

*With Best Compliments
From-*



**S. K.
KAMANI**

Autoply Harness Industries

Commerce House (1st Floor,
Room No. 3-A)
2, Ganesh Chandra Avenue
Kolkata - 700 013

Phone : 2213-2971, 2213-2907

Manufacturers of

Autoply [®] **BRAND**

Automobile Wiring Harness,
PVC Auto Cable, Battery Cable,
PVC Tape, Wiring Terminal
and Auto Electrical parts

Kasat Marbles

19, R. N. Mukherjee Road
2nd. Floor, Kolkata - 700 001

Ph. No. Office : 2248-9947
Deals in : Marble, Granites Tiles,
Ceramic Tiles, Stone etc.

Authorised Dealer of
KAJARIA CERAMICKS LTD.
'NAVEEN' brand tiles
REGENCY CERAMICES LTD.
BELLS CERAMICES LTD.
ORIENT TILES

Showroom :
32A, Tollygunge Circular Rd. Kolkata - 53
Show Room - 24004154 / 24002858

Godown :
3, Tarpan Ghat Road. Kolkata - 53
(Mahabirtala, B. L. Saha Road)
Godown : 2403-4014



অসুরনাশিনীর অষ্টশক্তি

নিখিল চিত্রকর

জগৎ পরিব্যাপ্ত এক অদ্বিতীয়া মহাশক্তি। আদিভূতা সনাতনী। বিভিন্ন কালপ্রবাহে তিনি বিভিন্ন রূপে আবির্ভূত হন জগতের কল্যাণের জন্য। পারিপার্শ্বিক দানবীয়, আসুরিক, পৈশাচিক ও পাশবিক শক্তিকে পরাজিত করে শান্তিসুখা সিঞ্জন করেন। তিনিই আনন্দপ্রবাহের উৎস।

কখনো দেবতাদের কার্যসিদ্ধির জন্য বা কখনো ভক্তের মঙ্গলের জন্য তিনি অস্ত্র ধারণ করেন। এই যেমন এখন তিনি দুই অহংকারী অসুররাজ শুম্ভ-নিশুম্ভের বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন।

যুদ্ধের প্রারম্ভে :

একবার শুম্ভ-নিশুম্ভ নামে দুই অসুর মহাশক্তিদ্বর হয়ে উঠল। অহংকার ও ক্ষমতার তাড়নায় তারা ত্রিলোক অধিকার করে বসল। দেবতাদের বিতাড়িত করে সূর্য, চন্দ্র, কুবের, যম, বায়ু, ও অগ্নির ওপর একচ্ছত্র অধিকার কায়ম করল শুম্ভ-নিশুম্ভ। এমনকী দেবতাদের জন্য নির্ধারিত যজ্ঞের আত্মতা বা ‘হবি’র ওপরও ভাগ বসালো তারা। এই

‘হবি’ গ্রহণ করেই তো পুষ্টি লাভ করেন দেবতারা! অগ্নিই তাঁদের পুষ্টিগ্রহণের একমাত্র মাধ্যম। শুম্ভ-নিশুম্ভ অগ্নিদেবকে নিজেদের আয়ত্তে এনে যজ্ঞাহুতির পুরোটাই হরণ করতে থাকল। নিরুপায় হয়ে পরাজিত ও দুর্বল দেবতারা জোট বেঁধে নগনন্দিনী দুর্গার শরণাপন্ন হলেন। তাঁর স্তব করলেন। মহাদেবী প্রসন্না হলে তাঁর শরীরের কোষ থেকে উদ্ভূত হলেন দেবী কৌশিকী। কৌশিকীর আবির্ভাবে দেবী দুর্গার গাত্রবর্ণ হলো কালো। সেই থেকে তিনি সমাদৃত হলেন কালিকা বা কালী নামে।

সেনাপতি চণ্ড-মুগুর কাছে দেবী কৌশিকীর অপরূপ সৌন্দর্যের কথা শুনে শুম্ভ-নিশুম্ভ দূত পাঠালো বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে। দেবী কৌশিকী সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে শুম্ভ-নিশুম্ভকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। একথা শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠল শুম্ভ-নিশুম্ভ। চণ্ড-মুগুর সঙ্গে বিশাল অসুরবাহিনী পাঠালো দেবীকে বন্দি করে নিয়ে আসতে। বলাবাহুল্য, তাদের সবাইকে ধরাশায়ী করলেন কৌশিকী। এতে শুম্ভ-নিশুম্ভ আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এবার তারা সমস্ত দৈত্যকুলকে নির্দেশ দিল একযোগে মহাদেবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। তাদের নেতৃত্ব দিল সেনাপতি রক্তবীজ।

রক্তবীজের ঝাড় :

কথায় বলে রক্তবীজের ঝাড়। অর্থাৎ আগাছার বাড়। যতই কাটো না কেন, তার শেষ নেই। যেমন মনের ষড়রিপু। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য। এদের দমন করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় বইকী। যাই হোক, সমস্ত দৈত্য সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে যখন আত্মফালন করে বেড়াচ্ছে, তখন মহাশক্তি দুর্গার আরেক রূপ দেবী কালিকা এলেন। তিনিও দৈত্যদের প্রতিহত করলেন। রক্তবীজ রণাঙ্গনে দৈত্যদের ছিন্নভিন্ন দেহের স্তূপ জমা হতে থাকল। সেনাপতি রক্তবীজ এবার যুদ্ধ করতে এগিয়ে এল। রক্তবীজকে যতই আঘাত করা হয়, তার দেহের এক একটা রক্তবিন্দু মাটিতে পড়ে অবিকল তারই মতো নতুন রক্তবীজ জন্ম নেয়। ব্যাপারটা অনেকটা আধুনিক বিজ্ঞানের ক্লোন-কনসেপ্টের মতোই। স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজের প্রতিলিপি গঠন করতে করতে একসময় সমস্ত রণাঙ্গন ছেয়ে গেল লক্ষ লক্ষ রক্তবীজে। এই দেখে দেবতারা উদ্বিগ্ন হলেন। দেবতাদের অস্ত্রিতার দরুন তাঁদেরই শ্রীঅঙ্গ থেকে সৃষ্টি হলো অষ্টশক্তির।

অষ্টশক্তির ইতিকথা

মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত ‘শ্রীশ্রীচণ্ডী’র অষ্টম অধ্যায়ে মহাদেবী দুর্গার অষ্টশক্তির উল্লেখ রয়েছে। তাঁরা হলেন ব্রহ্মাণী,মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী, বারাহী বা যজ্ঞ বারাহী,নারসিংহী ও চণ্ডিকা। প্রথম সাতজনের উদ্ভব সাতজন দেবতার শ্রীঅঙ্গ থেকে। আর চণ্ডিকার সৃষ্টি স্বয়ং আদ্যাশক্তি দেবী দুর্গার শ্রীঅঙ্গ থেকে। সমরক্ষেত্রে শুভ-নিশুভের বিপুল সৈন্য যখন দেবী কৌশিকী, দেবী কালিকা ও মহাদেবীকে ঘিরে ফেলেছে, তখন সেই অসুরদের বিনাশ করতে ব্রহ্মা, কার্তিকেয়, বিষ্ণু, ইন্দ্র, ও অন্য দেবতাদের মহাবীর্য ও মহাবল শক্তিরশি নির্গত হয়ে দৈবীশক্তিরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উল্লেখিত—

এতস্মিন্তরে ভূপ বিনাশায় সুরদিবাম্।

ভবায়ামরসিংহানামতিবীর্যবলাস্বিতাঃ।।

ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণুনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ।

শরীরেভ্যো বিনিষ্টক্ৰম্য তদ্রূপৈশচণ্ডিকা যযুঃ।।

অষ্টশক্তির মধ্যে প্রথমে এলেন ব্রহ্মাণী। ইনি ব্রহ্মার শ্রীঅঙ্গ থেকে সৃষ্ট। হংসযুক্ত বিমানে তাঁর আগমন। হাতে অক্ষমালা ও কমণ্ডলু। অক্ষমালায় নিহিত রয়েছে মন্ত্রশক্তি ও কমণ্ডলুতে অমৃতবারি। অমৃতবারি ছিটিয়ে তিনি ভক্তকে রক্ষা করেন ও অভক্তকে নাশ করেন। ব্রহ্মাণী হলেন নাদ ও ব্রহ্মশব্দধারিণী।

এরপর ত্রিশূল হাতে আগমন মাহেশ্বরীর। বৃষ তাঁর বাহন। মাথায়

চন্দ্রকলা। দুই বাহুতে জড়িয়ে আছে দুই মহাসর্প- অনন্ত ও বাসুকী। বৃষ ধর্মের প্রতীক। ত্রিশূল ত্রি-গুণ অর্থাৎ স্বত্ত্বঃ, রজঃ ও তমোগুণ নাশ করে মানুষকে নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ দর্শন করায়।

দেব-সেনাপতি কার্তিকেয় বা কুমারের অঙ্গীভূত শক্তি হলেন কৌমারী। ইনি ক্ষত্রিয় শক্তির মূর্ত প্রতীক। মায়া বিস্তার করে শত্রুদলের নজর থেকে নিজের সৈন্যদের গোপন করে রাখেন বলে তিনি গুহ-রূপিণী। ময়ূরবাহনা দেবী কৌমারী কামজয়ী, রিপুজয়ী এবং চিরকুমারী।

বৈষ্ণবী শক্তি গরুড়াসনা। চারহাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও খজ্জা। বিষ্ণু অর্থাৎ নারায়ণের মূল শক্তি বৈষ্ণবী। তাঁর শঙ্খে ‘ওঁ’ ধ্বনির প্রতिसরণ। চক্র কর্মধারা, গদা ন্যায়দণ্ড ও খজ্জা তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ। আসুরিক শক্তির পরাজয় ঘটিয়ে সত্য ও ধর্ম সংস্থাপন করেন দেবী বৈষ্ণবী।

বিষ্ণুর তৃতীয় অবতার বরাহের আত্মিক শক্তি হলেন বারাহী বা যজ্ঞবারাহী। সিংহবাহিনী বারাহীর দুই হাতে গদা ও চক্র।

ভগবান বিষ্ণুর চতুর্থ অবতার নৃসিংহের অঙ্গীভূত শক্তিই নারসিংহী। তাই তিনি অর্ধমানবী-অর্ধসিংহী। অসীম ক্ষমতার অধিকারিণী।

এরপর এলেন দেবরাজ ইন্দ্রের শক্তি ঐন্দ্রী। গজবাহিনী ঐন্দ্রীর হাতে বজ্র। জীবের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই তাঁর অধিকারে। সবশেষে আবির্ভূত হন চণ্ডিকা শক্তি। স্বয়ং জগজ্জননী মহামায়ার শ্রীঅঙ্গ থেকে উৎসারিত হয়েছেন তিনি। মহাকালের প্রলয়ঙ্কারী শক্তি চণ্ডিকা। তিনি কালাতীত। অর্থাৎ কাল বা সময় তাঁর অধীন। তাই তিনি অজেয়। তাঁর আরেক নাম ‘অপরাজিতা’। জটাজুটধারিণী চণ্ডিকা ভীষণা, করালবদনা। স্বয়ং শিবকে তিনি দূত করে পাঠিয়েছিলেন শুভ-নিশুভের কাছে। যাতে তারা আত্মসমর্পণ করে। তাই চণ্ডিকার অপর নাম শিবদূতী।

রক্তবীজবধ :

যুদ্ধক্ষেত্রে অষ্টশক্তি,যোগিণী-সহ অন্যান্য মাতৃশক্তির যুদ্ধ করছেন। অষ্টশক্তির প্রহারে সবাই নিহত হলেও রক্তবীজ ক্রমশ অজেয় হয়ে উঠছে। এসব দেখে আশ্ফালনরত শুভ-নিশুভ ধরেই নিয়েছে মহাশক্তির পরাজয় এবার আসন্ন। দেবতারা প্রমাদ গুনলেন। তাঁদের বিষণ্ণ দেখে চণ্ডিকা সহাস্যে কালীকে বললেন, ‘চামুণ্ডে! তুমি তোমার মুখগহ্বর মেলে ধরো। প্রসারিত করো তোমার রসনা (জিভ)। অস্ত্রের আঘাতে যখনই রক্তবীজের শরীরের রক্তবিন্দু বাইরে পড়বে তুমি সঙ্গে সঙ্গে তা পান করবে।’ চণ্ডিকার কথামতো কালিকা দেবী সারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিজের জিহ্বা ছড়িয়ে দিলেন। রক্তবীজের শরীর থেকে নির্গত প্রত্যেক রক্তবিন্দু পান করলেন। এরপর চণ্ডিকা রক্তমূর্তি ধারণ করে গদা, পাশ, শূল দিয়ে উপর্যুপরি আঘাত করতে থাকলেন রক্তবীজকে। তার শরীর থেকে রক্তের স্রোত নির্গত হলো। হাতে খর্পর (রক্ত ধারণ করার পাত্র) নিয়ে সেই রক্ত পান করলেন কালী। ফলে নতুন রক্তবীজ আর জন্মাতে পারলো না। একসময় ক্ষয় হতে হতে, রক্তশূন্য হয়ে পতন হলো মহাসুর রক্তবীজের।

স্থান-কাল-পাত্র :

এই আদি-অন্তহীন বিশ্বচরাচরে একমাত্র মহাশক্তিই ধ্রুবক। তিনিই

With Best Compliments
From :



Shree
Charity Trust

দুর্গা, তিনিই কালী, তিনিই আদ্যাশক্তি। তিনিই মহামায়া। তিনিই আবার বিষ্ণুর যোগমায়া। যুগেযুগে এই মহাশক্তির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণাপ্রবাহের বিচ্ছুরণ ঘটেছে। তার ক্ষয় নেই, তার লয় নেই। তার রূপান্তর ঘটেছে মাত্র। তাঁকে নতুন করে কেউ উদ্ভাবন করেনি। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই তিনি বিরাজমান। মহাশক্তি নিত্য।

বিজ্ঞানে শক্তির নিত্যতা সূত্রও তো তাই-ই বলে। শক্তির সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই, তাকে রূপান্তর করা যায় মাত্র। এই যে অষ্টশক্তি উৎসারিত হলেন দেবতাদের শ্রীঅঙ্গ থেকে তাও তো মহাশক্তির রূপান্তর। রক্তবীজ বধের পরবর্তী সময়ে দেবী যখন শুভাসুরকে বধ করতে চলেছেন, শুভ তখন ছলনার আশ্রয় নিয়ে দেবীকে বলে, “হে কৌশিকী! এই বধ্যভূমিতে আমি একা। আর তুমি অব্যবস্থাপক যোগিনী, মাতৃকাশক্তি, অষ্টশক্তির সাহায্য নিয়ে আমার সঙ্গে অসম-যুদ্ধে উন্নত হয়েছ। এটা অন্যায় যুদ্ধ!” দেবী হাসলেন। বললেন—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।

পশ্যোতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্তো মদবিভূতয়ঃ।।

অর্থাৎ, ‘এই জগতে একমাত্র আমিই আছি। আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কে? ওরে দুষ্ট! দেখ্ আমার বিভূতিসমূহ আমাতেই প্রবেশ করছে।’

এই বলে মহাশক্তি তাঁর মাতৃকাশক্তি, যোগিনী ও

অষ্টশক্তিসমূহকে নিজের মধ্যেই আন্তীকরণ করলেন। তারপর সমস্ত রণাঙ্গন জুড়ে রণচণ্ডীরূপিণী মহাদেবী দণ্ডায়মান হলেন। দেবীর কথায়—

অহং বিভূত্যা বহুভিরিহ রূপৈর্যদাস্থিতা।

তৎ সংহতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভব।।

প্রশ্ন উঠতে পারে, মহাশক্তি যেখানে একাই অগণিতের সমান, সেখানে কেন অষ্টশক্তি বা অন্যান্য শক্তির প্রয়োজন হলো? এর উত্তর মহাকালের অমোঘ সূত্রে বাঁধা পড়ে আছে। যদিও মহাকালও মহাশক্তির অধীন। দেখছেন না, মহাকালীর (মহাশক্তি) পায়ের তলায় শব হয়ে পড়ে আছেন স্বয়ং মহাকাল। আমরা বলি শিব। শিবের ‘ই’-কারাত্মক শক্তি হলেন মহাকালী। সেই শক্তি না থাকলে শিবও শব হয়ে পড়ে থাকেন। রক্তবীজ হোক অথবা শুভ বা নিশুভ যেকোনো আসুরিক শক্তিই হোক না কেন, তাদের বধ করা দেবীর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু মহাশক্তি দুর্গাকে অষ্টশক্তির সাহায্যেই এই সমস্ত অসুরকে বধ করতে হবে এটাই নিয়তি। তাই বলে, যা হবার তা সময়েই হয়। স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে ঘটে।

তথ্যসূত্র :

১। ‘সাধন সমর’ ব্রহ্মর্ষি শ্রীশ্রী সত্যদেব, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর। ২। ‘চণ্ডী চিন্তা’ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রী চণ্ডী প্রেস, কলকাতা। ৩। ‘শ্রীশ্রী সপ্তসতী দুর্গা’ গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর।



With Best Compliments From :

ALL INDIA ROAD TRANSPORT AGENCY AIRTA LOGISTICS PRIVATE LIMITED ALL INDIA PACKERS & MOVERS

Phone : Mobile : 9830020245 / 9831010261 / 9051060808 / 9163311779

E-mail : Kolkata@allindiatpt.com/airtalogistics@gmail.com

Web-site : www.allindiatpt.com

(H.O- 28, Black Burn Lane, Kolkata-700 012)

Behala : 363, Diamond Harbour Road, 14 No. Bus Stand,

M : 8981006500

TIME GURANTEED DELIVERY TRANSPORTERS FOR ALL OVER INDIA MARINE TYPE ISO CONTAINER
TRUCKS AVAILABLE.

SPECIALIST IN ODC CARGOES BY HEAVYDUTY TRUCKS & TRAILERS.

SPECIALISTS IN PACKING OF HOUSEHOLD GOODS & TRANSPORTATION BANK APPROVED (IBA)

BRANCHES & ASSOCIATES ALLOVER INDIA

With Best Compliments From -



Willowood Chemicals Limited

An ISO 9001 : 2008 Certified Company

Alloy Group



UTSAV INDUSTRIES PVT. LTD.



AIM TECHNOLOGIES PVT. LTD.



RAJ ALUMINIUM PVT. LTD.

Aluminium & Hardware People



503, Kamalalaya Centre, 156/A, Lenin Sarani, Kolkata-700 013. INDIA

Phone : 4050 3400

E-mail : info@alloyindia.com Website : www.alloyindia.com



বাপ্পালির পুতুল যেন এক মাঠ সরলতা

ড: রাজলক্ষ্মী বসু

বি ঠাকুরের ‘নতুন পুতুল’ আরও একবার পড়াই যায়। কিষণলাল, যিনি, রাজবাড়ির আঙিনায় পুতুল গড়লেন, তিনি ছিলেন মেলায় আসা নতুন কারিগর। কিছু রং দিত, কিছু দিত না। সেই পুতুল কিছু গড়ত, কিছু গড়ত না। দেখে মনে হতো পুতুল যেন কোনোকালেই ফুরাবে না। কিষণলাল নতুন সময়ের দাবি মেনে পুতুল গড়ল, অনেক বাহবা জুটল। কিন্তু প্রবীণের দল সেটাকে শিল্প অসম্মান বলে মনে করলেন। তাঁদের পছন্দ হলো না সেসব পুতুল। রাজকন্যারা বুড়ো পুতুলশিল্পীকে ছেড়ে কিষণলালের পুতুলে মেতে উঠল। বুড়োর মন ভাঙল, হতাশা এল। তিনি চলে গেলেন মেয়ের বাড়ি। নাতনির সঙ্গে দাদুর তখন কথা কাটাকাটি। বিষয় সেই কিষণলাল। নাতনি চায় দাদু আবারও পুতুল গড়ুক। কিন্তু দাদুর আত্মবিশ্বাস আর নেই। অবশেষে দাদু আবারও পুতুল গড়তে মন দিলেন। অর্থাৎ এই গল্প থেকে স্পষ্ট হয় পুতুল শুধুমাত্র খেলা নয়। তা শিল্প, সৃষ্টি, সৃজনশীলতা, বোধ, দরদ, কালের চাহিদা, তা একঝুড়ি সারল্য আবার এক আকাশ সাফল্যও। কিষণলালের মতো নতুন শিল্পী এলেই যে পুরনো দাদু পুতুল গড়বেন না, তা কিন্তু মোটেই নয়। বরং কচিকাঁচার চাহিদার জোরেই কিষণলাল ও দাদু দুইই থাকে। পুতুলে পুতুলে খেলাই হয় যে কেবল। হয় ঘর সাজানো। কখনও লৌকিক আচার পূজা। হয় ভালবাসার বিনিময়। পুতুলে পুতুলে

কখনওই ঝগড়া হয় না, খুনসুটি হয় না। তাই পুতুল শুধুমাত্র সৃষ্টিই নয়, আমাদের অনেক অনাসৃষ্টির উপশম করতে পারে পুতুল।

পুতুল কি আর নেহাতই হাতের খেলনা! পুতুল আসলে সংস্কৃতির সূচক। কৃষ্টির চিহ্ন। শিশু ভোলানাথের ‘পুতুল’ ছড়ায় দেখি রথের পাঁচ পয়সার পুতুলের জন্য শিশু মনের সে কী টান। রঙিন পুতুলে শিশুর এমন মন পড়ে যে, গুরুমশাই রেগে আগুন! পুতুল গেল ভেঙে। আসলে যেটা ভাঙে তাতো মন। পুতুলের মতো হেলাফেলা করছে আমরা কথার কথা বলি ঠিকই। কিন্তু পুতুলতো আমরা আগলে রাখি। বাঙ্গালি মেয়েদের পুতুল যত্ন, পুতুল সংরক্ষণ, পুতুলের সংস্কৃতি যদি দেখি—সে তো এক মহাসমুদ্র। সে কোনো খেলনা নয় তখন। সে একখানা আস্ত দেশ, বোধ, রুচি, মাটির দলিল। যেখানে যেমন মাটি, তার উপর নির্ভর করে তেমনই পুতুল। যেন মানুষের মরফোলজি! কৃষ্ণনগরের পুতুল আর মেদিনীপুরের পুতুল এক হবে না। যেমন মানুষের গাত্রবর্ণ ভিন্ন, তেমনই মাটির জন্য পুতুলের আকৃতিও ভিন্ন। রাজ্যজুড়ে এই বৈচিত্র্য যেন এক বিরাট পুতুল মেলা। আজ সেই পুতুলহাটে হাঁটব। নেড়েচেড়ে দেখব পুতুল ডালি। তাদের নাম পরিচয় বয়স জানব।

ঘোড়সওয়ারি পুতুল, পুলিশ পুতুল, বাবু পুতুল, ছাঁচের পুতুল, দুর্গা-কালী পুতুল, হিম পুতুল, যো পুতুল, পাটের পুতুল, রানি পুতুল,

গালার পুতুল, শিব- দুর্গা কাঠ পুতুল, রেল পুতুল, মালিক গাজির ঘোড়া, দীপাবলী পুতুল আরও কত কী। সমাজতাত্ত্বিকরা মনে করেন, সমাজ যত উর্বর পুতুল তত বৈচিত্র্য ধরে। বঙ্গের পুতুল বৈচিত্র্য বিশ্বের কোনোদেশে, কোনো রাজ্যে নেই।

রবিঠাকুর যোগেই নিবন্ধের সূচনা। এই ঠাকুরবাড়ির পুতুল বিবর্তনে কম অবদান নেই। কলকাতার ঘোড়সওয়ারি পুতুল আসতই না, যদি ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা অন্দরমহল ছেড়ে সেদিন ময়দানে জুতো পরে, মাথায় টুপি লাগিয়ে ঘোড়ায় চেপে হাওয়া খেতে না যেতেন।

সেদিনতো বাঙ্গালি তথা সারা দেশের অন্দরমহলে ঝড় উঠল। করে কী মেয়েরা! সেই রেনেসাঁর ঝড় লাগল কালীঘাটের পটুয়াপাড়ায়। কলকাতার ঘোড়ায় চড়া মেয়েদের পুতুল তৈরি হলো। যেন রুচিবোধের স্বাধীনতার এক অসম্ভব বিবর্তন দলিল। নারী মুক্তির ইঙ্গিত হয়ে রইল ঘোড়াসওয়ারি পুতুল। পুতুল স্বীকৃতি দিল বাইরের আলো, খোলা আকাশ, ডানা মেলা মেয়েদের নবজাগরণের জন্য বড্ড দরকার। পুতুল সেদিন খেলনা নয়, হলো মুক্তির প্রতীক। আজিমগঞ্জ কাটোয়ার দিকে গেলে কাঁটারিয়াতে এখনও খোঁজ মেলে পুলিশ পুতুলের। যাদের মাথায় লালটুপি। এরাও ঘোড়ার পিঠে টগবগ করে চলে। ঠগি কমিশনের ফাইলে লেখা আছে ইংরেজ আমলের চতুর দারোগাদের কীর্তি। কর্নওয়ালিস নতুন পুলিশ ব্যবস্থা শুরু করলে জমিদার পৃষ্ঠপোষক ঠগিদের বেগ পেতে হয়। এই পুলিশ পুতুল সেই ঠগিদের ঠেকানোর ইতিহাস মনে করায়।

মজিলপুরের বাবুপুতুলেরও এক নিবিড় ইতিহাস আজকেও জেগে রয়েছে। যশোরের দত্ত জমিদারেরা মজিলপুরে এসে বসবাস শুরু করেন প্রায় দুই শতাব্দী আগে। তাঁদের এক পেয়াদা ছিলেন, নাম কালীচরণ। তাঁর আরও একটা গুণ ছিল পুতুল বানানো। তিনিই বানাতে শুরু করলেন মাটির টেপা পুতুল। রংবেরঙের তাদের জামা, চোখ মুখ হাসি। মজিলপুরে এখনও এক খোল, দু-খোলের পুতুল পাওয়া যায়। কলসি কাঁধে মেয়ে, বেনেবউ, পৌরাণিক দেবদেবী। যেন রূপকথার এক সিরিজ। আবার জয়নগরের ছাঁচের পুতুল যেন এইমাত্র কথা বলে উঠবে। এমন নিটোল তার গড়ন। হাতে টেপা

পুতুলের থেকে এ বেশ কিছুটা অন্যরকম। এই পুতুলের ভিতরটা ফাঁপা। পুতুল পুড়িয়ে তারপর রং করা, তারপর গর্জন তেল মাখানো। বিষ্ণুপুরের হিঙ্গুল পুতুল সেও এক ঐতিহ্য। যষ্ঠী পুতুল, হিঙ্গুল পুতুল কাছাকাছি হলেও। যষ্ঠীর কাঁধে শিশু থাকে, যা হিঙ্গুলে থাকে না।

এই পুতুলের সব রংই গাছগাছালির থেকে তৈরি। পুতুল উজ্জ্বল করতে লাগানো হয় সিনাবার, এক লালচে খনিজ। বাঁকুড়া পুরুলিয়ায় সিনাবার পাওয়া যায়। হিঙ্গুল পুতুলের আবার কখনও কখনও পরনে ফ্রক। মাথায় রিবন। উচ্চতা? মাত্র এক আঙুল। বাঁকুড়ার কার্তিক ফৌজদারের বংশধর শীতল। হিঙ্গুল পুতুল শীতল ফৌজদারের পরিবার বানাতে। তারপর বংশপরম্পরায় পরিবারের মেয়েরাই এই পুতুল বানিয়ে চলেছে। আগে মজিলপুরের বাবু পুতুলের কথা হলো। একই ভাবে আছে দুর্গা- কালী পুতুল। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই পুতুল বানিয়ে যাচ্ছে মন্মথনাথের পরিবার। ঝাড়গ্রামের নয়গ্রাম, যে ক'ঘর পটুয়া তাঁরাতো পটে আঁকেনই। তার সঙ্গে আঙুল টিপে যো পুতুল গড়েন। বেলে মাটিকে হাতের তালুতে নিয়ে তাঁরা গড়ে তোলেন পাখি, কুকুর, বাচ্চা, মা ও সন্তান। যো পুতুল যাঁরা বানান অর্থাৎ পটশিল্পীরা মুসলমান। অথচ নিঃশব্দে তাঁরা হিন্দুত্বকেও বহন করছেন সাবলীল ভাবে।

উত্তরবঙ্গের দিকে পুতুল হাটে পাওয়া যায়। রায়গঞ্জের মালিক গাজির ঘোড়া। শরীরে তার নকশা আলতো দুলকি।

তার গ্রীবা ঋজু। যদিও এই ঘোড়ার ইতিহাস বাঙ্গালি সংস্কৃতির পরিপন্থী। বকতিয়ার খিলজির ঘোড়া বদাউন থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত দৌড়াত। ঘোড়ার বীরত্বে প্রশংসা করতেই হবে। কিন্তু বর্বর আগ্রাসী খিলজি বাঙ্গালির ইতিহাসে কালো অধ্যায়, বিকৃত সময়। কিন্তু ঘোড়ার শ্রম যখন শিল্পীর দক্ষতায় ফুটে ওঠে, তখন তা শুধুমাত্রই শিল্প। মুর্শিদাবাদের পাটের পুতুল খুব মিষ্টি জনপ্রিয়। এদের নাম আছে— খেদি নাকি, বুঁচি নাকি, চেপটি। পাটের সব জিনিস তৈরির পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই দিয়ে খেদি বুঁচিদের গড়া হয়। তাদের পাটের জামা রঙিন। পাট বঙ্গদেশের সোনার সূতো। তাই এই খেদি বুঁচিরাও ভারী সোনা মেয়ে। হাওড়ার রানি পুতুল আবার একেবারেই

M.T. GROUP

Estd. 1954

M.T. MECHANICAL WORKS

M.T. INTERNATIONAL

EN. EN. ENGG. WORKS

D-75, Phase - V, Focal Point, Ludhiana - 141010 (Punjab) India

Ph: 91-161-2670128, 2672128 Fax : 91-161-2673048, 5014188

E-mail : mtgroup54@sify.com Visit us at : www.mtexports.com

Manufacturers :

Domestic Sewing Machine & Parts, Overlock Machines, Industrial Machine, TA-1,
Embroidery, Bag closer and Aari Machines

অন্যরকম। এর গড়ন যষ্ঠীপুতুলের মতো হলেও এরা আদৌ তা নয়। পোড়া মাটির পুতুলে লাগে অভ প্রলেপ। লাগে গাঢ় গোলাপি রং। খুব যে আকর্ষণীয় তা বলব না, তবে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এও স্বতন্ত্র। বর্ধমানের নতুন থামের সূত্রধর সম্প্রদায়ের মানুষরা দারুণ এক শিল্প সম্ভাবনাকে টিকিয়ে রেখেছেন।

তারা কাঠের শিব-দুর্গা মূর্তি বানান। মূলত ত্রিকোণা কাঠের টুকরো সংগ্রহ করে এমন পুতুল গড়া চলে। রাজা রানি, রামায়ণের চরিত্র থেকে লক্ষ্মীর পেঁচা। শ্রীচৈতন্য ভক্তি আন্দোলনকালে এই পুতুল খুব প্রচার পেল। কখনও চণ্ডীমঙ্গল তো কখনও দুর্গার আদুরে মূর্তি। যেন বাঙ্গালির চিরকালের এক সাংস্কৃতিক রুচি রং তুলিকে হাসিতে খুশিতে ভরিয়ে রেখেছে। পূর্ব মেদিনীপুরের গালার পুতুল এই অঞ্চলের সিগনেচারি স্টাইল।

অত্যন্ত যত্ন পরিশ্রম মনযোগের ফসল এই পুতুল। উজ্জ্বল তাদের রং। আরও আশ্চর্য, পুতুলের মাটি সংগ্রহ হয় উই ডিপির থেকে। সেই মাটি চারদিন জলে ভেজানো থাকে। মাটি গাঁজিয়ে উঠলে তার থেকে কাঁকড় পৃথক হয়। পশ্চিম মেদিনীপুরের মির্জাবাজারে দীপাবলীর সময় গেলে দেখা যাবে বাতি পুতুল, অসংখ্য প্রদীপ হাতে পুতুল। পুতুলটি দেখলে মনে হবে যেন এক নারী। তারা কেউ আবার ঘোড়ায় চড়ে। যেন ঠাকুর বাড়ির ঘোড়সওয়ারী পুতুলের মতো এরাও অমাবস্যা অন্ধকার দূর করতে এসেছে। যেন আবারও পুতুল প্রতিষ্ঠা করল যা অশুভ, যা অন্ধকার তা দূর হোক নারীর হাতেই। আমাদের জীবনশৈলী জীবন্ত হয় পুতুলের রূপে রঙে হাসিতে এবং অবশ্যই তার মাটিতে। লোকায়ত শিল্প থেকে আঞ্চলিক রীতিকে পাকাপাকি প্রকাশ করে পুতুল। প্রত্যেকটি আঞ্চলিক পুতুল পরিবেশবান্ধব। তারা অর্থনৈতিক বাস্তবত্বের ভারসাম্য রক্ষার্থে ভূমিকা পালন করবে যদি তাদের যথাযথ বাণিজ্যিক প্রসার করা যায়। বাঁকুড়ার সাম্ভার যে বোঙা হাতি, তা কি আর শুধুমাত্র পুতুল? তা সাঁওতাল দেবতা সিংবোঙাকে উৎসর্গ করার জন্য তৈরি। মুর্শিদাবাদের কাঁঠালিয়ার কুমোরেরা তৈরি করেন থামের নকসীকাঁথা। জাঁতা পেশাইত মহিলা, গয়লানি, চুল বাঁধা মেয়ে আরো কত কী। এইসব পুতুলের দেহ তৈরি হয় চাকে। মুখ হয় ছাঁচে। হাত পা তৈরি হয় হাতে। উত্তর দিনাজপুরের কুনুরে যে মা ও ছেলে পুতুল গড়া হয়—তা কর্মরত নারীর চিত্র। কখনও পিঠে সন্তান, কখনও কোলে।

তাঁতিবেড়ে, উত্তর চব্বিশ পরগনার নজরনগরে চাকা লাগানো নৌকা, পাঙ্কি তৈরির চল আছে। কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল বাস্তবধর্মী। ঘূর্ণির পুতুল তৈরি শুরু সেই কোন কালে রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হল বাস্তবমুখী পুতুল গড়ার রীতি।

আজকের সফট টয়, বারবি ডলের বাজারে এইসব বাঙ্গালি সংস্কৃতির পুতুল তার বাণিজ্যিক দর অনেক হারিয়েছে। শিশুরা এইসব পুতুল চেনেই না। অথচ এই পুতুলগুলি পরিবেশবান্ধব, অর্থনৈতিক বাস্তবত্বেরও অনেক বেশি দেশীয় স্থানীয় বাজারে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে যদি তা যথাযথ দিশা পথ বাণিজ্য কৌশল পায়। সফট টেডি দেখতে অনেক সময়ই বেশি আকর্ষণীয় কিন্তু তা আদৌ শিশু স্বাস্থ্যবান্ধব নয়।

আমাদের বঙ্গের পুতুল শুধুমাত্র শিল্পে না, বাণিজ্য ঘরেও তারা একঘর হাসি হাসুক। তারা তা থৈ বলে নেচে উঠুক। পুতুল নাচেও তো ছন্দ কেটেছে। এ আমাদের বাঙ্গালিদের অযত্ন। ডিজে বাজিয়ে নিজেরা নাচি কিন্তু পুতুল নাচের কী হাল সে খোঁজ রাখি কই। বঙ্গের মেলা সংস্কৃতিতে পুতুল বিক্রির সঙ্গে পুতুলনাচ প্রদর্শনটাও ছিল এক রৈখিক অঙ্গ।

১৮৮৫ সালে নাট্যগোষ্ঠী জ্ঞানদা চক্রবর্তী পুতুলনাচ সংস্থা গঠন করেন। পৌরাণিক জনপ্রিয় পালা বারবার জীবন্ত হয়েছে পুতুল নাচে। পুতুল নাচের সঙ্গে এক নিবিড় ইতিহাস বাণিজ্য যোগ ছিল একটা সময়। গঙ্গারিডি সভ্যতায় যখন পুতুলনাচ হচ্ছে তখন গ্রিসের সঙ্গে ছিল বাণিজ্যিক সম্পর্ক। সেই সময় বঙ্গের থেকে তামা, গুড়, গন্ধদ্রব্য, মাটির খেলনা, মশলা, রেশম রপ্তানি করত গ্রিসে। তখন থেকেই বঙ্গের পুতুলনাচ পৌঁছায় গ্রিসে। তা ছড়াল সারা ইউরোপে। ইউরোপে পুতুল নাচ অনেক উন্নত হলেও আমাদের পুতুল নাচ; পুতুল নাচেই আটকে গেল। এখানে পুতুল নাচে, সংলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়। এখানে দরকার পুতুল এবং নাটক পালা। কৃষ্ণনগরের গিরিশ আচার্য, তারু মিয়া, ব্রাহ্মণবেড়িয়ার রাজ হোসেন, কালু মিয়া, এমন বহু শিল্পীর হাতে সুতোতে নেচে, ঘাড় নেড়ে, মাথা ঝাঁকিয়ে, অভিব্যক্তি প্রাণময় করে তুলত পুতুল। ওরা আমাদের মত আচরণ করত পুতুল নাচিয়েদের দক্ষতায় গুণে। বঙ্গে সবথেকে বেশি প্রচলিত ছিল ডাং পুতুল। এছাড়াও ছিল কাপড়ের পুতুল, তারের পুতুল ও বেণী পুতুল। ছোটো যাত্রাপালার রূপান্তর পুতুল নাচ। নদীয়ার পুতুল নাচ যে কতটা ঐতিহ্যের তার প্রমাণ পাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-র ‘কাঠের পুতুলি যেন কুহকে নাচায়’-এ। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী জানা যায়, কুহক সম্প্রদায়ের জীবিকা ছিল পুতুলনাচ দেখানো। আমরা বাঙ্গালিরা বলি আহুদি পুতুল। মূলত কৃষ্ণনগরে মাটির একধরনের পুতুল তৈরি হতো শুধুমাত্র পুতুল নাচের আগে শিশুদের ভোলানোর জন্য। রাধাবল্লভ জীউয়ের মেলাতেও এই আহুদি পুতুল আসত। সেই পুতুল দেখার আনন্দে কিন্তু বুড়ো আর শিশুর ভেদ ছিল না। নদীয়ার বেণী পুতুলের বৈশিষ্ট্য, তাতে শুধুমাত্র মানুষরূপী পুতুলই নাচত এমন নয়, পশুপাখিরূপী পুতুলও নাচত। পুতুল নাচ—পুতুল, মানুষের সংলাপ, কাহিনি, পিছন থেকে হাতের টানে জীবন্ত করা মানুষরূপী পুতুলশৈলীর এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ সংযোগ সহাবস্থান। পুতুল নাচ কেবলমাত্রই নৈপুণ্য নয়, এ একদল আড়ালের সহযোগীদের সঙ্গে পুতুলের ভাব বিনিময়। পুতুলগুলো মানুষ হয়ে ওঠে। আর আমরা অজান্তেই পুতুল। পুতুল এবং পুতুলনাচ দুইই আমাদের ঐতিহ্য অহঙ্কার, আবার লুপ্তপ্রায়ও।

“আমার এই ছোট্ট বুড়ি, এতে রাম রাবণ আছে

দেখে যা নিজের চোখে হনুমান কেমন নাচে।

এ সুযোগ পাবেনা আর, বল ভাই কি দাম দেবে—

পুতুল নেবে গো পুতুল...”

আমাদের পুতুল যতক্ষণ জীবন্ত ততক্ষণ সরল সরস সংস্কৃতিটাও নাচবে, চোখ পিটপিট করে ইতিহাস-দেশ-কালকে দেখাবে। এক ঝাঁপি পুতুল আসলে এক মাঠ সরলতা, অকৃত্রিমতা। □

বাস্তলার গ্রামে একটি দিন

এষা দে





‘মা’ তাড়াতাড়ি করো। সাতটা বেজে গেছে। সাড়ে সাতটা টার্গেট। ‘উফ, এই বয়সে অত তাড়া করতে পারি? ব্যাগ গোছাতেই তো কত সময় যায়। এত ওষুধট্যুধ নিতে হয়।

‘একটা চেষ্টা নিয়েছো তো? বাই চাপ যদি কাপড় বদলাতে হয়। গত বছর মনে আছে ‘নদীর কুলে’ রেসর্টে বিকেলের চায়ে হাত ফস্কে পুরো তোমার শাড়িতে পড়ে গিয়েছিল? ভাগ্যিস সঙ্গে একসেট শাড়ি ব্লাউজ ছিল।

‘এই জন্যেই বলি, তোদের ওই সব রেসর্ট ফেসর্টের প্রোগ্রামে আমাদের মতো বুড়িদের নিস না। এবারে তো আবার এত লম্বা জার্নি। সঙ্গে দুটো বড়ো বোতল জল নিতে হবে। কী? সব রেসর্টে বোতলের জল পাওয়া যায়? আরে রাস্তায় তো লাগতে পারে। আমার আবার দু’ঘণ্টা পর পর বাথরুমে যাওয়ার কথা। তোদের হাইওয়ের পেট্রোল পাম্পের টয়লেট, মানে পাবলিক টয়লেটের যা ছিри। সঙ্গে ‘পি সেফ’ নিতে হয়। কী যে বিরক্তিকর।

‘ই কোলাইয়ে ক’বার ভুগলে মনে নেই? ডাক্তার মিত্র তো বলেই দিয়েছেন, জল খাবে আর জল ছাড়বে। হিহিহি।’
‘ফাজলামি রাখ। ‘কী যে বাংলা বল না তুমি।

‘ফাজলামি আবার কী। এটা কি তোমার ‘দ্যাশের বাষা’ নাকি?

‘তোরা তো কখনো দেখলি না, মায়ের দেশ, বাপের দেশ। মর্ম কী বুঝবি?’ ‘আর বুঝে কাজ নেই। খালি লোক আর লোক গিজগিজ করছে। তার ওপর ওইতো এতো টুকু একটা জায়গা। আমাদের একটা স্টেটের সমান। তোমাকে বলেছি? এবারে কোম্পানির অ্যানুয়েল কনফারেন্স হচ্ছে মুম্বাইতে, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া থেকে আমি এক মাত্র মেয়ে ডিলার।’

‘বাপস কী ফান্ডা! ওনলি ওম্যান ডিলার বলে কথা। ফটো উঠবে। তোর ওই শর্মাজ বুটিকের শাড়ি নিতে ভুলিস না।’
খাওয়ার টেবিল থেকে ফোঁড়ন কাটে ছোটো ভাই তোতন। ধীরে সুস্থে ডিমের পোচটা কায়দা করে মুখে ঢোকাতে ঢোকাতে। দিদির উইক এন্ড প্রোগ্রামে সে আর তার স্ত্রী থাকে না। তাদের সব আলাদা প্রোগ্রাম। টুং টাং টুং টাং। টুং টাং টুং টাং।

‘ওই যে রে তোর ঢঙের মোবাইল বাজছে। এমন হাইফাই পিয়ানো বাজনা রিং টোন নিয়েছিস যে নিজেই শুনতে পাস না। ‘না কি তোর মতো তারস্বরে ‘দিল দিওয়ানা’ বাজবে? যা যা বেশি বাতেল্লা দিস না।

হ্যালো? অনিদি? বিনিদি এসে গেছে? কাল রাতেই এসে রয়েছে? ভালোই হলো। তোমরা রেডি? হ্যাঁ আমরা প্রায় রেডি, জাস্ট পাঁচটা মিনিট দাও। দরজার সামনে থেকো। আমি আর ভেতরে গাড়ি ঢোকাবো না।’

ডিসেম্বরের শুরু। এবারে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। পরিষ্কার হালকা নীল আকাশ। খোলা জায়গায় বেড়াবার, দিনযাপনের পক্ষে আদর্শ আবহাওয়া। একটি টাটা সুমোতে ঠাসাঠাসি করে চলেছে ড্রাইভার বাদে, আটটি প্রাণী, মিলি ও তার মা প্রতিভা, তার পিসতুতো দুই দিদি বিনিতা অনিতা এবং তাদের মা নিভাননী অর্থাৎ মিলির বড়ো

পিসি ও তাঁর সারাক্ষণের আয়া, মায়া, যে এত ঠেসে গেছে যে প্রায় তাঁর কোলে বসা, এবং মিলির খুড়তুতো বোন রুমকি ও তার মা অপর্ণা।

পুরো প্রমীলা পার্টি। মায়েদের পরনে সব ছাপা সিল্কের শাড়ি, কার্ডিগান, তার ওপর শাল জড়ানো, কান মাথা ঢেকে স্কার্ফ, একেবারে শীতের মোকাবিলায় প্রস্তুত। মেয়েদের আধুনিক পোশাক, সেই প্রায় পা পর্যন্ত ম্যাক্সি ড্রেস, তলায় লেগিংস, ম্যাচিং কার্ডিগান বা লেটেষ্ট ফ্যাশানের কোট। এরা সবাই স্বাধীন জেনানা, মহিলা শিল্পোদ্যোগী, ডিজিটাল ক্রিয়েটর না কী সব করে বুঝতেই পারা যায় না, একজন আধা সরকারি কনসার্নে আধিকারিক ছিল, অন্যজন অবশ্য সেকেন্ডে মার্কা স্কুল টিচার, (এখানে মাথায় টাটি)। প্রত্যেকে দরকারে অদরকারে একা একা হিল্লি দিল্লি করে বেরায়। তাছাড়া পুরুষমানুষ হাতের কাছে কই। পিসতুতো বড় দাদা সস্ত্রীক সর্বদা শ্বশুরবাড়িতে ছুটির দিন কাটায়, তার বউ একমাত্র মেয়ে কিনা। মিলির বর ব্যাঙ্গালোরে চাকরি করে।

বিনিতা ওরফে বিনি, সেই আদর্শ বাঙ্গালি নারী, একাধারে আধুনিক ও রক্ষণশীল, স্বামী ও দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে বছর বিশেক এলআইসিতে চাকরি করে দিব্যি সংসার ও জীবিকা এক সঙ্গে চালাচ্ছিল। হঠাৎ কোথা থেকে এক গুরুতর উদয় হলো এবং তাঁকে নিয়ে এমন মেতে গেল যে চাকরি থেকে ভিআরএস নিয়ে বসল, সংসার থেকেও ছুটি। অতঃপর তার অবহেলিত বরের অল্পবয়সি একটি রিসেপশ্যানিস্টের সঙ্গে জমে গিয়ে পরিবার ত্যাগ। ছেলে-মেয়েরা মায়ের আধ্যাত্মিক ক্রিয়া কর্মে বীতশ্রদ্ধ। তারা দাঁড়িয়ে যাবার মতো অবস্থায় আসতেই যে যার রাস্তা করে নিয়েছে। বিনির ভ্রক্ষেপ নেই। একা ফ্ল্যাটে গুরুদেবের বিরাট ছবি টানিয়ে দিনরাত নাম জপ, ধ্যানে ব্যস্ত। নয়তো গুরুজির আশ্রমে অগণিত ভক্তের সঙ্গে বসে তাঁর বাণী শ্রবণ। মুশকিল হলো হাঁটু কনকন করলে, পড়ে গিয়ে হাত ভাঙলে, ভাইরাল অ্যাটাক করলে গুরুদেব দেখেন না। একলা ফ্ল্যাটে তখন আপন লোক চাই। মায়ের বয়স আশি পেরিয়ে নব্বই ছুই ছুই, তার ওপর কন্যার গুরুভক্তি ও ফলে তার সংসারের এই হালে একেবারেই সমুপ্ত নন। দেখা হলেই কঠোর বাক্যবাণ বর্ষণ করেন। তিনি বরং জামাইয়ের পক্ষে। ছোট বোন অনি তার অগতির গতি। হ্যাঁ, সে দায়ে বেদায়ে তাকে দেখাশুনা করে। অন কন্ডিশান যে তার কাছে গুরুদেব বা জপতপ ধ্যান এসব কথা উচ্চারণ করতে পারবে না। অনি নিজে একেবারে মুক্ত নারী। বিয়ের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডিভোর্সি, লোকচক্ষে একা। কানা ঘুসো শোনা যায় তার বাঙালির চেয়ে বেশি বাঙালি অর্থাৎ বাঙ্গালিতর এক উত্তর ভারতীয়, স্থায়ী বয়ফ্রেন্ড আছে, তার সঙ্গে বিদেশটিদেশ ঘোরে, সে আবার বিবাহিত কিনা, কিন্তু রহিস আদমি। তার যোগাযোগেই বেশ ক’বছর প্রোমটার ডেকোরেটরদের সঙ্গে লাইন করে ঘর সাজানোর সৌখিন জিনিসেরপত্রের ব্যবসা চালিয়েছিল। কিছু টাকা পয়সা করে নিয়ে এখন নিজেই অন লাইনে কী যেন করে। বিধবা মায়ের দায়দায়িত্ব

তার। আজকাল বাঙালি সমাজে বাপের বাড়িতে সাবালিকা মেয়েরা স্থায়ী হলে সেটাই দম্ভর। বাকি রুমকি একমাত্র কলকাতায় স্বামী সন্তান নিয়ে সংসার করে। একটি নামী স্কুলের শিক্ষিকা, একমাত্র কন্যা আমেরিকায়, রিসার্চ করছে। স্বামী সুজয় আলিপুর আদালতে বেশ ভালো পশার ওয়ালা উকিল। এত ব্যস্ত যে উইক এন্ড আউটিং তার চলে না, তার বিশ্রাম মানে বাড়িতে ভালো খাওয়াদাওয়া করে ঘুম। অনেক সাধাসাধিতেও আজ সঙ্গে আসতে রাজি করানো যায়নি। রুমকির মা অপর্ণা মেয়ের কাছেই থাকেন, ছেলে রণজয়ের চাকরি ও সংসার দিল্লিতে যেখানকার গরম আর ঠাণ্ডা কোনোটাই তাঁর সহ্য হয় না। সব পরিবারেই আধুনিক ছেলে-মেয়ের শাসনে মায়েদের বৈধব্যের সাদা শাড়ি নিরামিষ খাওয়া, একাদশী-অম্বুবাচীর মতো কৃচ্ছ সাধন ইত্যাদি তুলে দেওয়া হয়েছে। তারাই অভিভাবক। ‘আশির ওপরে বয়স বলে উপোস করে থান পরে ঠাকুরঘরে বসে হরিনাম জপ করবে, সেটি হচ্ছে না। বাবা গেছেন, আমরা তো আছি। যেমনটা তোমাদের আমরা দেখতে অভ্যস্ত তেমনই পোশাকআশাক পরবে, আমাদের সঙ্গে সমান তালে চলবে।’ তাদের সাফ কথা। নিভাননীর বিরাগভাজন হওয়া সত্ত্বেও দিদির দিব্যি সঙ্গে নিয়ে এসেছে অনি। বিনি পুরো গ্রুপের মধ্যে লম্বায় চওড়ায় মায়েদের মতো, অর্থাৎ সাধারণ বাঙ্গালি পুরুষকে টেকা দেয়। মায়া আয়া বটে, কিন্তু একেবারে রোগা প্যাঁকাটি, ছোটখাটো। দরকার মতো বিশাল কায়া নিভাননীকে হুইল চেয়ারে ঠেলা, অন্য দুজন সিনিয়র সিটিজেনকে যারা কেউই একেবারে তব্বী নন, বাথরুমে হেল্প করা ইত্যাদিতে বিনি কাজে লাগবে। স্বার্থ ছাড়া বাস্তবে মেয়েরা আজকাল কিছু করে না। তারা আর শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্র নয়।

রবিবার, রাস্তা ফাঁকা। শহর ছাড়িয়ে, এমনকী হুগলি ব্রিজ ছাড়িয়ে হাইওয়েতে পৌঁছতে খুব বেশি সময় লাগল না। দুদিকে আর ঘর বাড়ি নেই। গাড়ি চলছে হু হু করে। দু’ধারে ফাঁকা মাঠ দেখতে দেখতে নিভাননী বলেন, ‘বাবা, যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কলকাতার ওই ঘিঞ্জি, সরু গলি আর গায়ে গায়ে সঁটে থাকা বাড়ির মধ্যে যেন দম আটকে আসে।’

প্রতিভা বলে ওঠে, ‘যা বলেছ দিদি। এ দেশের লোকে বাড়ি বানায় দেখ, কোন দিকবিদিক জ্ঞান নেই। আরে পুব দক্ষিণ একটু খোলা রাখ। সেসব এরা জানেই না।’

সেকালের বিএ পড়া অপর্ণা যোগ করেন, ‘ইটের পরে ইউ মাঝে মানুষ কীট। সাধে কী আর কবি বলেছেন।’

‘এই রে তোমার আবার রবিঠাকুর এসে গেল।’ শিক্ষিকা মেয়ে রুমকির মুদু স্বরে হালকা অনুযোগ। মিলি তার সঙ্গে যোগ দেয়, ‘বাবা, সারা জীবন তো তোমরা ওই ঘিঞ্জি গলিতেই কাটালে, এখনো অভ্যেস হলো না। কই আমাদের তো কিছু খারাপ টারাপ লাগে না।’

‘তোদের আর কেন কিছু লাগবে। তোদের তো এই শহরেই জন্মকর্ম। আমাদের তো তা নয়। হাতপা ছড়িয়ে আমরা মানুষ হয়েছি। কত বড় জায়গা জুড়ে সব বাড়ি ঘর উঠোন। হাঁটাচলা

করেও কী সুখ। জায়গার কোনো অভাব ছিল না। চারিদিকে খোলামেলা, গাছপালা, পুকুরডোবা মাঠঘাট খালবিল, আর নদীর কথা তো বাদই দিলাম। আমরা তো সব ও দেশে জন্মেছি রে।

অনি মিলি রুমকির কোরাস, ‘দ্যাশের কেবল শুনুম না। শুনুম না।’

এবারে বিনির মধ্যে প্রবেশ। গুরুজনদের রক্ষায় এগিয়ে আসে, ‘ওদের বাদ দিন তো। যা হয়েছে না এরা! মাথায় শুধু আজকের দিনটা, কাজ আর মজা, ব্যস ওই জীবন। পুরো বৈষয়িক দৃষ্টিভঙ্গি। আপনারা আমাদের বলুন। আমার খুব ভালো লাগে আগেকার দিনের কথা, ওপার বাংলার গল্প।’

‘এখানে নয়, এখানে নয়।’ আবার কোরাস। ড্রাইভার ছোট্ট অনেক দিন চাকরি করছে। সর্বদা তার মহিলা শিল্পোদ্যোগী মালিকিনকে নিয়ে তার কাজের সূত্রে পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষত দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যায়। এবার সে বলে ওঠে, ‘সামনে আজাদ হিন্দ ঢাকা আতা হাঁয়, বিরেকফাস্ট খাবেন না?’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ, গাড়ি লাগা,’ মিলির নির্দেশ।

‘শোন, জলখাবারে বেশি কিছু খেও না, তাহলে দুপুরে খেতে পারবে না।

কত যেন রে মাথা পিছু নিয়েছে?’ নিভাননী জানতে চান।

‘এমন কিছু না, মাথাপিছু হাজার টাকা।’

‘শুনলি এদের কথা। মানে আমাদের ন’ জনের জন্য ন’ হাজার! এ টাকায় আমাদের সকলের বাড়িতে পুরো সপ্তাহের কাঁচা বাজার হয়ে যায়, জানিস?’ নিভাননীর অভিযোগ।

‘উফ মা, তোমাকে না কত বুঝিয়েছি কমার্সিয়েল হিসেব বাড়ির খরচের সঙ্গে তুলনা করা যায় না।

আরে লাভ না করলে বিজনেস চলবে কী করে? ‘অনির সওয়াল।

‘তার ওপর একটা ঘরের ভাড়া, পুরো দিনরাতের। শুধু বাথরুমের জন্য। কোনো মানে হয়।’ প্রতিভা যোগ করেন।

‘মা, তোমরা হিসেব বন্ধ করতো।’ মিলি ধমক লাগায়।

অপর্ণা এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন এবার মুখ খোলেন।

‘আমাদের বয়সে দুপুরে খাওয়ার পর একটু না গড়িয়ে নিলে চলে না। ওদের মতো আমরা তো সারাদিন অফিস কাছারি করতে অভ্যস্ত নই। লবিটবিতে ওই পাঁচ জন বাইরের লোকের ব্যবহার করা বাথরুমে যেতে বাপু কেমন গা ঘিন ঘিন করে।

‘এইতো হক কথা। সাধে কী আর ছোট মামিকে আমরা মিষ্টি মামি বলি।’ অনি সুযোগ পেয়ে একজন গুরুজনকে দলে টানে।

‘আর আমি বুঝি তোদের তিতা মামি?’ প্রতিভা অনুযোগ করেন।

‘ওমা, তুমি যে আমাদের টকঝালমিষ্টি মামি, একেবারে মুখরোচকের চানাচুর। বাঙ্গালির সফল উদ্যোগ, মাড়োয়ারির সঙ্গে লড়ে যাচ্ছে।’ হাহা হাহা হিহিহি।

‘দিদি ঢাকা আ গিয়া—’

‘চল চল, ভিতরে চল, গাড়ি লাগিয়ে দে,’

মিলি বলতে বলতে ছোট্ট গাড়ি কম্পাউন্ডের ভিতরে ঢুকিয়ে পার্ক করে। হাইওয়ের ওপর অবস্থান, দূরপাল্লার যাত্রীদের নিয়মিত থামা, শারীরিক প্রয়োজন ও লঘু/গুরু ভোজনের উপযুক্ত চমৎকার স্থান। দিব্যি আধুনিক এবং পরিষ্কার তকতকে ওয়াশরুমে সকলে পালা করে ফ্রেশ হয়ে ডাইনিং রুমে ঢোকে। বিরাট রেস্টুরাঁ, এই সকালেই বেশ খন্দের জুটে গেছে। বসেই মেনু নিয়ে বিতর্ক, বেড়াতে এসে বাড়ির নিত্য নৈমিত্তিক টোস্ট ডিম চলবে না, লুচি আলু ছেঁচকি চাই।

‘আরে এখানে লুচি নেই, পুরি সবজি, তাও আবার আটার পুরি। প্রচণ্ড হেভি, আমাদের বাঙ্গালি পেটে বোমার মতো পড়বে,’ ‘দুপুরের লাঞ্চ-এর বারোটা’। ইত্যাদি।

ওয়েটার কলম প্যাড হাতে দাঁড়িয়ে। ‘আচ্ছা ইথার হালকা জল খাবার কিছু মিলেগা? নিভাননীর রাজ ভাষার ওপর হামলায় নির্বিকার ওয়েটার খাঁটি বাংলায় জবাব দিল, ‘পেপার ধোসা নিন, হালকা হবে।’

‘বেশ তাই দিন। আমরা ন’জন— ‘আমরা নর্থ ইন্ডিয়ান ঢাবায় সেদো পেপার ধোসা খাবো না, না না।’

‘আলু পরোটা নিন, এখানকার ফেমাস ডিশ, সঙ্গে দই আর ফ্রেশ পুদিনার চাটনি।’ খাঁটি বঙ্গীয় ওয়েটারের সাজেশান গৃহীত।

তিন জন সিনিয়রের পেপার ধোসা, বাকিদের আলু পরোটা অর্ডার দিতে দিতে ছোট্ট অনুযোগের স্বরে বলে, ‘দিদি হামার জন্যে পুরি সবজি আচ্ছা হতো।’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ ওর অল্প বয়স, খাক পুরি সবজি ওর দেশের খাবার খাক। আচ্ছা, মায়া, তুমিও কি পুরি;’

‘না না মাসিমা, আমি দিদিদের সঙ্গে আলু পরোটাই খাবো।’

তিন রকম অর্ডার হলেও বেশ তাড়াতাড়িই এসে গেল। আসলে খন্দেররা সব তো যাত্রী, কেউ এখানে বিশ্রাম করতে আসে না। বেশি সময় লাগালে চলবে কেন। খাওয়া শেষে মৌরি মিছরি চিবোতে চিবোতে সমবেত রায়, পেপার দোসা সাউথ ইন্ডিয়ান দোকানের মতো না হলেও মোটামুটি চলনসই, আলু পরোটা দারুণ, পুরি-সবজিও ঠিক হ্যাঁয়।

আবার গাড়িতে। স্থান পরিবর্তন করে বসা হলো। তবে ড্রাইভারের পাশে মিলি। এই সিটে তার মৌরসিপাট্টা, কারণ গাড়িটা তার নিজস্ব কোম্পানির, তাছাড়া তার মোবাইলে জিপিএস ধরেই যাওয়া হচ্ছে, যদিও অনিতাও জিপিএস দেখছে, রিসর্টের সন্ধানটা তো তার মারফতে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটনের মানচিত্র তার নখদর্পণে। কত জায়গায় যায়, ভিডিও তোলে, পোস্ট করে উপযুক্ত প্ল্যাটফর্মে। রীতিমতো পেশাদার। তাতে রেসর্টগুলো থেকে নিশ্চয় কিছু উপার্জন হয়। অনিতা ঠিক জনসেবায় নিবেদিতপ্রাণ নয়।

প্রবীণারা পেটে কিছু পড়তেই ঝিমিয়ে গেছেন। খানিক ক্ষণ সবাই চুপচাপ। রাস্তার দু’দিকে কখনো ফাঁকা মাঠ, কখনো ছোট বসতি অর্থাৎ সেই পরপর বুপড়ি দোকানের সারি, ছড়ানো ছিটানো আবর্জনা। যেমন তেমন করে তৈরি ছিরিছাঁদ হীন বাড়ি

ঘর। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ঘেয়ে হয়ে যায়। ভ্রমণ বিশারদ অনিতার খেদ, ‘কবে যে আমরা এই বুপড়ি দোকান আর যত্রতত্র নোংরা থেকে নিষ্কৃতি পাব। ফরেনে গেলে নিজেদের দেশের রাস্তাঘাট, এই বুপড়ি আর নোংরার কথা ভাবলে লজ্জা হয়। ফিরতে ইচ্ছে করে না। সাথে কী আর আজকাল ছেলে-মেয়েরা সব বিদেশে যাবার জন্য প্রাণপাত করছে। এই দৃশ্য কেউ দেখতে চায় না, মিলি যোগ করে।

‘আর একবার ওদেশে যেতে পারলে ফেরত আসার নাম নেই।’ সগর্বে খেদ প্রকাশ করে রুমকি।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কখনও ফাঁকা মাঠ, কচিং বড় কিছু গাছ। সেও খানিক বাদে একঘেয়ে। নিভাননী ঝিমোচ্ছেন। প্রতিভা এক সময় দুঃখ করেন, ‘আশ্চর্য, গ্রামট্রাম নেই, কলকাতার বাইরে এসেছি, মাঠ ভরতি ধান দেখব, সবুজের কোলে বাঙলার গ্রাম দেখব। না, সব খালি।’

‘আরে দিদি, হাইওয়ের ধারে ওসব থাকে না।’ অপর্ণার মন্তব্য।

‘একটু ভিতরে ঢুকলে সব পাবে, মাইমা, কোনো চিন্তা নেই।’ অনির আশ্বাস দান।

‘ছট্টু, আস্তে চালা, সামনে মোড় থেকে আমাদের হাইওয়ে ছেড়ে বাঁ দিকে ছোট রাস্তায় ঢুকতে হবে।’ মিলির নির্দেশ। বলতে বলতে এসে গেল টার্নিং। ‘এই রাস্তাটা দিয়ে ৪০ কিলোমিটার গিয়ে আর একটা রাইট টার্ন, সেখান থেকে ১৫ কিলোমিটার।’ এবারে সরু রাস্তা, দু’দিকে একটু ঢালু। কিছুটা গিয়ে ইতস্তত

*With Best Compliments
From :*



**Banwarilal
Sharma**

গাছ পালা, ঝোপঝাড়। ভিতরে দূরে একতলা বাড়িটাড়ি দেখা যায়, সব পাকা বাড়ি নয়। বড়ো রাস্তা থেকে সেসব লোকালয়ের দিকে আরও সরু সরু রাস্তা চলে গেছে। সেখান দিয়ে লোক নিয়ে ট্রেকার আসছে। এমন অবস্থায় স্পিড নেওয়া যায় না। হাইওয়ের মতো ধেয়ে আসা বিশাল বিশাল দৈত্যের মতো দশ-বারোটা চাকাওয়ালা ট্রাকের দৌরাড্য নেই বটে কিন্তু মাঝে মধ্যে প্যাসেঞ্জারভরতি বাস আসা যাওয়া করছে। সরু রাস্তায় তাদের জায়গা দিতে কসরত করতে হচ্ছে ছোট্টকে।

‘আর কতক্ষণ?’ নিভাননী প্রশ্ন করেন।

‘মোট ২০ কিলোমিটার এসেছি। বললাম না, ৪০ কিলোমিটার যেতে হবে।’ ‘সে কী রে এতক্ষণে মোটে ২০।’

‘দেখছই তো এটা হাই ওয়ে নয়, এখানে কী করে স্পিড নেবে। কেন তোমরা তো দ্যাশের মতো গাছপালা ঝোপ ঝাড় খানাডোবা চাইছিলে, এই তো সব আছে। এখন ঘ্যান ঘ্যান করছ যে বড়!’ অনির ধমক খেয়ে গুরুজনেরা চুপ। ‘আসলে তোমাদের এতক্ষণ ধরে ছোট্ট স্পেসে ঘেঁষাঘেসি করে বসে থাকার তো অভ্যাস নেই। তাই একটু অধৈর্য। একটা কাজ কর, মনটা অন্যদিকে দাও। সুন্দর কিছু একটা স্মৃতি মনে কর। দেখবে আর খারাপ লাগছে না। গুরুদেব বলেন জগৎ আমাদের মনের ভিতরে, বাইরে যা দেখি সেটা মায়া।’ ‘বিনির মনস্তাত্ত্বিক আধ্যাত্মিক বক্তৃতা।

অনির গম্ভীর কণ্ঠে ওয়ানিং, ‘গাড়িতেই গুরুকে এনে ফেললি।’ অপর্ণা তাড়াতাড়ি মাঝখানে পড়েন, ‘বিনি তো পরামর্শটা মন্দ দেয় নি। বড়দি মনে আছে আমরা সেই সেবার বটানিক্যালে পিকনিকে গিয়েছিলাম? তখন ওঁরা সবাই ছিলেন। কী বিরাট দল হয়েছিল আমাদের। মনে আছে?’

‘তখন মিলির সবে বারো ক্লাসের টেস্ট পরীক্ষা শেষ হয়েছে— ‘আর রুমকি তখন দশ ক্লাসে, রণ ইঞ্জিনিয়ারিং সেকেন্ড ইয়ার,’ প্রতিভার সঙ্গে অপর্ণাও সেদিনের কথায় মেতে যান।

ওদিকে মিলি সামনের সিটে এক মনে জিপিস এস দেখে যাচ্ছে। ‘ছোট্ট, সামনে আর একটা টার্ন, এবারে বাঁয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখিস একটু নীচু আছে রাস্তাটা।’ কিছুটা যেতেই গাড়ি নাচতে থাকে।

‘বিস্কুল রদি রাস্তা’, ছোট্টর অভিযোগ।

‘আসলে আমরা তো একেবারে ইন্টরিয়রে যাচ্ছি, খাঁটি পল্লীগ্রামে। এখানে রাস্তাঘাট তেমন নেই, ডেভেলপমেন্ট তো নামকা ওয়াস্তে।’ ‘রুমকির শিক্ষিকাসুলভ ব্যাখ্যা।

‘উফ বাবা রে, কী ঝাঁকুনি।’ নিভাননী কাতরে ওঠেন।

‘দেখলে তো, এই জন্যেই জোর করে কোমরের বেল্টটা পরিয়ে দিয়েছিলাম। তখন পরতে চাইছিলেই না। না পরলে তোমার কোমর ব্যথার কী হাল হতো বলতো।’

অনি অভিভাবকত্ব ফলায়। রুমকিও মাকে ঘাড়ে কলার পরিয়ে এনেছে, স্পন্ডলাইসিস আছে কিনা। মিলি মায়ের নিক্যাপ দুটো নিয়ে এসেছে, সে রকম হাটা হাটি করতে হলে পরিয়ে দেবে। মোটে ১৫ কিলোমিটার পথ কিন্তু রাস্তার গুণে যেন ৫০ মনে হচ্ছে। এখন দুদিকে বেশ ঘন জঙ্গলের মতো গাছপালা।

‘একী রে, এষে পুরো বনবাসে যাচ্ছি,’ নিভাননীর স্বর আরও কাতর।

‘কেন, দ্যাশে তো এমনই সব ছিল, ছিল না? সেখানে সব পিচঢালা রাস্তা ছিল বললে তো চলবে না। তাছাড়া শুধু রাস্তা দিয়ে আর ক’টা জায়গায় বা যেতে, সেখানে তো একটা দুটো নদী না পেরিয়ে, নৌকোতে না চেপে, কেউ কোথাও যেতেই পারত না। বাব্বা কী ডিফিকাল্ট লাইফ। ভাবাই যায় না।’ অনি বড্ড চৌঁটকটা।

‘অভ্যাস, সব অভ্যাস’, মৃদু কণ্ঠে বলেন প্রতিভা। ‘আমার কোন দিন অভ্যাস হত না। জলে আমার যা ভয়।’ শান্ত রুমকি পর্যন্ত মন্তব্য করে।

গাড়ি চলেছে তো চলেইছে। অনি মৃদু স্বরে প্রায় গুন গুন করে গান ধরে, ‘শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কী আছে শেষে পথের?’

‘হি হি হি। অনিদি, তুমি পারোও বটে।’ ‘আরে এটা তো সেই কবে কার গান, আমাদের সময়কার, তুই জানলি কী করে?’ প্রতিভা বিস্মিত। ‘জ্যেঠিমা, আজকাল এ সব গান ক্লাসিক হয়ে গেছে, মোবাইল ছোঁয়ালেই শুনতে পাওয়া যায়।’ রুমকির জ্ঞানদান।



অবশেষে কোনো এক সময় পথের শেষ হলো। সামনে একটা সরু মেঠো রাস্তা, গাড়ি যায় না। দূরে গোরুবাছুর আটকাবার মতো কাঠের ফটক। দু’দিকে মস্ত উঁচু জেলখানা টাইপের পাঁচিল চলে গেছে। দরজা খুলে নামতে নামতে মিলি বলে, ‘অবশেষে পৌঁছানো গেল। এসো পিসিমণি নামো।

‘এতক্ষণ বসে থেকে পা একেবারে পাথর। মায়া, ধরো।’

‘ছইল চেয়ার লাগবে নাকি? না? পারবেন তো? বেশ, মাসিমা নামুন।’

একে একে সবাই নামে। সামনে কোনো ঝকঝকে নির্মাণ নেই, নেই সহাস্য রিসেপশান। ফাঁকা মাঠের মধ্যে বুনো গাছপালা। তলায় মাটির রাস্তা আর এতক্ষণ রাস্তার দু’ধারে যে দৃশ্য দেখতে দেখতে আসছিল সেটাই যেন চলেছে। দু’দিকের ন্যাড়া জমিতে পার্থক্য বিশেষ নেই। সবাই একটু যেন দমে যায়।

‘ছোট্ট, তুই দুটো ব্যাগ নে, বাকিরা, আরে এগুলো আমরা নিজেরাই নিতে পারি, জাস্ট শপিং ব্যাগের মতো তো।’

সবাই আস্তে আস্তে এগোয়। কাঁচা মাটির এবড়োখেবড়ো রাসশেওড়া, এখান ওখানে ইতস্তত ধুলো মাখা বড় বড় হেলাফেলায় বেড়ে ওঠা আটপৌরে শাল শেওড়া অশ্বখ গাছগুলির নেহাত সাধারণ গ্রাম্য চেহারা। কী গাছ খেয়াল করতেও মন চায় না। তার সঙ্গে যেন মানানসই সাদাসিধে ভঙ্গিতে আটপৌরে শাড়িপর্য দু’টি শামলা স্ত্রীলোক দ্রুত পদে কাছে এসে বলে, ‘দিন

দিদি আমাদের দিন।’ ওদের হাত থেকে ব্যাগগুলো নিতে যায়।

মেয়েরা মাল বইছে! কেমন অস্বস্তি লাগে। লিঙ্গ সাম্যে সকলেই ঘোর বিশ্বাসী হলেও মাল বওয়ার মতো কাজটাজ যেন পুরুষ করলেই তারা স্বস্তি বোধ করে।

‘থাক থাক, আরে এগুলো আমরাই নিয়ে যেতে পারব।’ মিলি অনি বিনি রুমকি সমস্বরে বলে ওঠে। ওরা ছাড়ে না, সঙ্গে সঙ্গে হাঁটে। ‘দিন দিদি আমাদের হাতে দিন।’ শেষে বাধ্য হয়ে গোটা দুয়েক ব্যাগ আর জলের বোতলগুলো ওদের দেয়। ওদের থেকে এক মাথা লম্বা বিনি নিজেরটা ছাড়ে না। সবাই এগোয়। একেবারে যেন গ্রাম। কোনো পরিকল্পনা নেই, বাহারি রঙ্গন কী পঞ্চমুখী জবা নেই, নেই মোরম ফেলা রাস্তা, দু’দিকে কেয়ারি করা শীতের মরশুমি চন্দ্রমল্লিকা ডালিয়া এমনকি আটপৌরে গাঁদা ফুলের রঙচঙে বাহার। রুমকি সাবধান করে, ‘দেখে হাঁটো, মাটি সমান নয় কিন্তু।’

মিলি আর অনি ফিসফিস করে, ‘যা গাঁইয়া স্যাম্পল, এদের অফিসটফিস রিসেপশানটান আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।’

দূরে একটি একতলা টালির চালের বড় বাড়ি, মাটি থেকে বেশ উঁচুতে, চওড়া কয়েক ধাপ সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। পুরো বাড়িটার দৈর্ঘ্য বরাবর লম্বা টানা ঢাকা চওড়া বারান্দায় কিছু আসবাবে বসার জায়গা। আটদশ জনের বসে খাওয়ার মতো কয়েকটা টেবিল ও হেলান ছাড়া কাঠের বেঞ্চিও রয়েছে, যেন স্কুলের টিফিন খাবার আয়োজন। সপ্তের স্ত্রীলোক দু’টির মধ্যে বয়স্ক পৃথুলাটি সিনিয়র মনে হচ্ছে, সেই বলে, ‘মাসিমা, দিদিরা এখানে একটু বসুন। এতটা রাস্তা এলেন। শরবত খাবেন তো।’

‘তোমাদের অফিসটা কোথায়? এই যা, তুমি বলে ফেললাম, কিছু মনে করবেন না।’

‘না না তুমিই বলুন। আমরা গাঁয়ের মানুষ, ওসব আপনি টাপনি শোনার অভ্যাস নেই। হ্যাঁ, যা জনতে চাইছিলেন, অফিস বলুন, বসার জায়গা বলুন, খাবার জায়গা সব এই খানেই।’

‘ও।’ সবাই যেন একটু দমে গেল। বসে চারিদিকে তাকায়। কাঠের মোটা মোটা আসবাবপত্র। টেবিল চেয়ার কোনো কিছুতে যেন পালিশ নেই। এক কোণে ছোট একটা কাঠের স্ট্যান্ডে একটা বড় মাটির কলসী রাখা। ও বাবা, কলসীর গায়ে নীচের দিকে বকবকে পিতলের কল। তলায় মস্ত মাটির জালা রাখা। ও হরি হাত ধোয়ার বেসিনের দিশি সংস্করণ। তাই বল, এখন মাথায় ঢোকে, এথনিক টাচ। সাজসজ্জা সব গ্রামীণ জীবনের। হাত মোছার নতুন গামছা থেকে দেওয়ালে এখানে ওখানে হাতপাখা আর কুলোর সারি, ওপরে পাকা ছাদ নয়, টালির তলায় কাঠের কড়িবরগার মতো স্ট্রেম থেকে বুলছে বড় বড় শুকনো ধুঁদুল, এককালে পা ঘসার জন্য কেনা হতো। পুরো ব্যাপারটাই পরিকল্পিত, রেসর্টের বিজ্ঞাপনেই ছিল, খাঁটি বাঙ্গলার পল্লী গ্রাম, ঘরোয়া আবহ, পরিবেশবান্ধব ব্যবস্থাপনা। পিছনে দেওয়ালে দুটো দরজা দেখা যাচ্ছে। একটার ভেতরে দেখা যাচ্ছে অফিস।

অন্যটা দিয়ে সোজা গেলে বোধ হয় ভাঁড়ার ও রান্নাঘর। অনি আর মিলি অফিসে ঢুকে দু’মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে এল।

‘আরও এক জন গাঁইয়া মহিলা ওখানে। বললেন, ওসব আধার কার্ড চেকটেক কিছু করার নেই, আমরা অত কাগজপত্রে বিশ্বাস করি না।’

‘মোস্ট পিকিউলিয়ার। কোনো রেসর্ট এ রকম ঘরোয়া টিলেঢালা দেখিনি।’

এবারে আরও একটি ওই এক সাজসজ্জার স্ত্রীলোক, ইনি মধ্যমা, ট্রেতে করে মোটা মোটা বকবকে কাঁসার গেলাস ভর্তি পানীয় এনে টেবিলে রাখল।

‘ঠাণ্ডার মধ্যে চা কফি পেলে ভালো হতো।’ অনি গোমড়া মুখে বলে।

‘বেশ তো, দিদি, করে দিচ্ছি। ক’জন খাবেন? চা না কফি? কফি? দু’জন? একটু বসুন।’

নিভাননী ধমকের সুরে বলেন, ‘তোদের সব সময় আবদার। এঁরা শরবত করে ফেলেছিলেন— ‘না না মাসিমা, কিছু অসুবিধা নেই। আপনারা এতটা রাস্তা গাড়িতে এক টানা বসে এসেছেন। একটু হাত পা ছড়ান। কিছু মুখে দিন। তার পর আপনারদের ঘরে নিয়ে যাব, জিনিস পত্র রাখবেন। নিশ্চিত্তে ঘোরাঘুরি করবেন, কত কী এখানে দেখার, আপনারা তো সবাই কলকাতা থেকে এসেছেন?’

হুঁ হুঁ। সবাই মাথা নাড়ে। শরবতে চুমুক দিয়ে এক বাক্যে রায়, ‘না খুব ভালো করেছে, ঠিক পরিমাণ লেবুর রস, মিষ্টি, আবার একটু গন্ধলেবুর ছোঁয়াও আছে।’ ‘পাতিলেবু গন্ধলেবু সব আমাদের গাছের। এখানে যা খাবেন সব এই ‘বাঙ্গলার গ্রামে’র ফসল।’ ‘ওমা তাই নাকি!’ সমস্বরে বিশ্বাস ও হর্ষ প্রকাশ। ‘সবাই মিলে ন্যাকামি করো না, নেটে এসব দেখেই তো সিলেক্ট করা হয়েছে,’ চাপা গলায় অনির ধমক। ‘সারাদিন আছেন, সব ঘুরে দেখুন।’ ‘নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। সেই জন্যেই তো এত দূর আসা।’

শরীরে একটু ওআরএস প্লাস ভিটামিন সি পড়তেই সকলে চান্স। পৃথুলার নির্দেশে এক জন তব্বী চলল তাদের গাইড হয়ে। বাড়িটির এক ধার দিয়ে পিছনের দিকে হালকা কিন্তু উঁচু দরমার বেড়ার আড়ালে এক ফালি খোলা জায়গা, দু’চারটি মাঝারি গাছ, পিছনে মামুলি কয়েকটি ঘর। সামনে দুটো বড় গাছে বাঁধা দড়িতে কাপড় শুকোচ্ছে।

‘দারোয়ান, মালি, যারা দিনরাত সারা বছর থাকে তাদের কোয়ার্টার।’

‘আর তোমরা?’

‘আমরা সবাই এই কাছের গ্রামে থাকি। যখন গেস্ট আসেন, আমরা আসি, ঘরদোর ঝাড়া-মোছা রাঁধাঝাড়া পরিবেশন ধোয়াধুয়ি সব করি। আবার তাঁরা চলে গেলে আমরাও গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাই।’ সরল অকপট স্বীকারোক্তি।

‘দ্যাখ মোটে কয়েকটা পার্মানেন্ট আর বেশিরভাগ ক্যাজুয়েল স্টাফ দিয়ে কেমন দিব্যি চলাচ্ছে।’ সামনে এগিয়ে যেতে যেতে



অনি বলে।

‘একটা জিনিস খেয়াল কর গেস্টদের সার্ভিস দেয় যে মেয়েরা, তারাই ক্যাজুয়েল, আর পুরুষরা দিব্যি পার্মানেন্ট। কী আনফেয়ার।’

অনি আর মিলি রেসর্টের পুরুষবাদী প্রশাসনিক চরিত্র সমালোচনায় লেগে যায়।

‘বি প্র্যাক্টিকাল। রেসর্ট তো চলে শীতের তিনটে মাস, মেরে কেটে আর একটা। বাকি সময় তো রেসর্টে বলতে গেলে কেউ আসে না। তখন রাঁধুনিটাধুনি দিয়ে কী হবে। কিন্তু মালিকে বছরভর গাছপালা খেত দেখতে হয় বা দারোয়ানকে পাহারা দিতে হয় পুরো প্রপার্টি।’ রুমকি ব্যাখ্যা করে।

‘স্ট্রীলোকগুলো বেশ হাসিখুশি, ভাবভঙ্গিতে মোটেই অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছে না।’ বিনি মানুষের মনোভাব বুঝতে এক্সপার্ট।

‘এই অজ পাড়াগাঁয়ে ওদের রোজগারের কীই-বা উপায় আছে। তবুতো এখানে কয়েক মাস কাজ পায়। সেটাই বা কম কীসের।’ অপর্ণা ছোটদের আলোচনায় ইতি টানেন। এদিকে কথা বলতে বলতে তব্বীর নেতৃত্বে সবাই গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে মোঠো রাস্তা ধরে পৌছেছে একটা ফাঁকা জায়গায়। সামনে একটি এক তলা চারকোণা মাটির বাড়ি। লাল টালির মতো দেখতে ছাদ। চার দিকে চারটি দরজা। বাইরে চওড়া টানা বারান্দা চারদিকে

ঘেরা। কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠতে উঠতে তব্বী জানায়, ‘এইটা হচ্ছে, বনলতা কটেজ, এর এক নম্বর রুম আপনাদের।’

বনলতা ! মিলি, রুমকি, অনি ও বিনির পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়া।

‘অন্য কটেজ গুলোর নাম কী?’ প্রতিভা জিজ্ঞাসা করেন।

‘ঝুমকো লতা, মালতী লতা, কুঞ্জ লতা। প্রত্যেকটাতে এরকম চারটে করে ঘর।’

‘শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ নয়, জীবনানন্দের বাংলা,’ ‘হিহিহি।’ বাংলায় এম.এ. অনির মন্তব্যে সমবেত প্রতিক্রিয়া।

বনলতা ঘরটি বেশ বড়। দেওয়ালে হাত দেয়, মাটির মতো দেখতে, কিন্তু গাঁথনি আসলে ইটের। গৃহসজ্জায় মাটির ছোঁয়া। হারিকেনের মতো ইলেক্ট্রিক লাইট। খাটের পাশে বেডসাইড টেবিলে ল্যাম্প দু’টি যেন প্রদীপ। গ্রামের ডেকর, ব্যবস্থায় মডার্ন। মোটামুটি যা যা প্রয়োজন সব আছে। প্রতিভা সর্বাগ্রে বাথরুম ইন্সপেকশন করে রিপোর্ট দিলেন, না সব ঠিক আছে, সাদা টালির মেঝে দেওয়াল, পোসেলিনের বেসিন, ডবলিউ সি সঙ্গে টয়লেট শাওয়ার, নতুন ছোট সাবান, ধোপ দুরন্ত তোয়ালে। ‘যাই বল, বাথরুমে কিন্তু গ্রামের কালচার চলবে না, সেখানে মডার্ন শহুরে ব্যবস্থা চাই।

আচ্ছা, তোমরা দ্যাশে এই ব্যাপারটা ম্যানেজ করতে কী

ভাবে? ওখানে তো কলের জল মডার্ন বাথরুম কিস্যু ছিল না।’

‘যে সময়ে, যেখানে যেমন ব্যবস্থা তেমন চলতাম। তখন এসব চোখে দেখা দূরস্থান, শুনিইনি।’

‘থ্যাংক গড, এখানে চলে এসেছিলে। আমরা তো ভাবতেই পারি না.....’

‘অনির কথার মধ্যে পড়ে বিনি, ‘আরে বাথরুমটা কি জীবনের সব? তোদের মনটার একেবারে বারোটো বেজে গেছে। যে দেশ আর মানুষকে নিয়ে আমাদের জীবন....’

‘দিদি, প্লিজ তোর গুরুগিরি রাখ।’

প্রতিভা ধমক লাগান, ‘সবাই বাজে কথা রাখ দেখি। এই ক’বছর হল তো টালির চেকনাই, ডব্লিউসি, বেসিন সব হয়েছে। তার আগে এতো বছর তো ওই সিমেন্টের মেঝে, চোবাচ্চায় রাখা জলে স্নান করতি, আর সেই এখন যাকে বলিস ইন্ডিয়ান স্টাইল হয়ে তাইতে ছোটো বেলা থেকে অভ্যস্ত ছিলি। দেখ দিদি, কী ফুটানি হয়েছে এদের।’

‘যে যে ফ্রেশ হতে চাও, যাও। এখানে বসে সময় নষ্ট করে কী হবে।’ অপর্ণা প্রসঙ্গ বদলে দেন। সবাই একে একে যায়, অল্প বয়সিরা ঝটপট ব্যাগ থেকে সাজের জরুরি সরঞ্জাম বের করে মেকআপ রিটাচ করে নেয়। নিভাননী হাসতে হাসতে মন্তব্য করেন, ‘এই অজ পাড়া গাঁয়ে কাদের দেখাবি সাজগোজ?’

‘পিসিমণি, ফুলের ফুটিয়াই সুখ।’ রুমকির পর্যন্ত শিক্ষিকাসুলভ গাভীর্ষ ত্যাগ।

এবারে সবাই রেডি। বাইরে বেরিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে আবিষ্কার করে প্রথম দর্শনে গোটা ব্যাপারটা যতটা এলোমেলো মনে হয়েছিল ততটা মোটেই নয়। একটা মোটামুটি পরিকল্পনামাফিক সব কিছু। সেই ইতস্তত বড়ো বড়ো এলেবেলে গোছের গ্রামের মতো পরিবেশ। মধ্যে দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে মেঠো রাস্তা। বাঁ দিকে প্রথমে চলে। দু’জনে কোনোক্রমে পাশাপাশি যেতে পারছে। প্রায় লাইন করে।

‘কী পিসিমণি, হাঁটতে পারবে তো, নাকি ছোট্টকে বলব?’

‘আরে, খুব পারব। ছোট্টবেলায় আমরা কি আর ট্রামেবাসে চড়েছি? সর্বত্র এই পা দু’খানাই তো ভরসা ছিল। এখন না হয় বাতের ব্যথায় কাবু।’

কিছুটা গিয়েই সমবেত বিস্ময়, কী সুন্দর সবুজ আর সবুজ। এদিকে ওদিকে একের পর এক বড়ো বড়ো চারকোণা খেত। অনি আর মিলি দৌড়ে এগিয়ে যায়, ‘ওমা, দ্যাখো দ্যাখো, ওগুলো সব বাঁধাকপি। কী অপূর্ব লাগছে, চারদিকে ঘন সবুজ পাতা ছড়িয়ে মাঝখানে হালকা সবুজ ফুলটি যেন ফুটে আছে। সজ্জি যে এত সুন্দর হতে পারে, কেউ ভেবেছিলে?’ কথার সঙ্গে মোবাইলে ক্যামেরায় ছবি। রুমকি আর বিনি পিছন পিছন দৌড়ে আসে। মায়েদের নিয়ে আস্তে ধীরে আসে মায়া।

বিশাল এলাকা জুড়ে পর পর খেত। বাঁধাকপি, ফুলকপি গেল এবার কী। ‘আরে বাপস, এসো এসো, দ্যাখো তোমরা ভাবতেই পারবে না কীসের খেত।’ ‘যে যার নিজের গতিতে গিয়ে

হাজির হয়। ব্রোকলি! ব্রোকলি! অনি, বিনি রুমকি মিলি মোহিত।

‘ইস্, ভাগ্যিস ‘বাঙ্গলার গ্রাম’ চুজ করা হলো। বাজারে একটা ব্রোকলির কত দাম বলতো। আর ফুলকপি বাঁধাকপি তো বছর ভর এখন পাওয়া যায়। কিন্তু ব্রোকলি শুধু শীতে। খানদানি ব্যাপার।’

‘আরে রাখ তোদের ব্রোকলি। যন্ত সব বিলাতি হুজুগ। ব্রোকলি দিয়ে একটা পদের নাম কর দেখি যে খেয়ে ফুলকপির ডালনা কি বাঁধাকপির চচ্চরির মতো মুখে লেগে থাকে।’

‘কেন ব্রোকলির সুপ, তারপর তারপর স্টারফ্রাই ব্রোকলি—’

‘সব চপ্পের ইউটিউবের রান্না,’ প্রতিভাও ননদের দলে। অপর্ণা মৃদু হেসে ব্যাল্যাম রাখেন, ‘খেতে যাই হোক, উপকার নাকি ভীষণ।’

‘এইতো আমার মিষ্টি মামি জিন্দাবাদ।’ অনির কথা শেষ নাহতেই এবারে অন্যদিকে এগিয়ে যাওয়া মিলি ও রুমকির আবিষ্কার, ‘এখানে দ্যাখো কী রকম টমাটো ফলেছে।’

বিনি পিছিয়ে নেই, ‘আর বেগুন দেখবে না? ঐয়ে ওদিকে।’ ক্রমে পালাং শাক, শালগম থেকে শিম, কড়াইগুটির সান্ধ্য লাভ। সঙ্গে চলে ছবি তোলা। অন্যদিকে পাতিলেবু, গন্ধলেবুর মতো স্থায়ী গাছ কত। নানা শেডের সবুজ আর সবুজ। বেশিক্ষণ ভালো জিনিসও ভালো লাগে না। ক্রমে একঘেয়ে হয়ে যায়। অনভ্যস্ত পা আর চলতে চায় না। শীতকাল হলেও সূর্য ঠিক মাথার ওপরে। এখন বেশ একটু গরম লাগছে। বয়স্করা শাল, স্কার্ফ খুলে মায়ার জিন্মায় দিয়ে দিয়েছেন। নিভাননী, প্রতিভা, অপর্ণার যেন পা ধরে আসে। কিন্তু মেয়েদের উৎসাহের শেষ নেই। তারা আবিষ্কারের আনন্দে এগিয়েই চলেছে। আর জায়গাটাও এত বিরাট, প্রায় একটা ছোটোখাট গ্রাম। নীরব সঙ্গিনী বোঝাবাহক মায়া কিন্তু খেয়াল রেখেছে। মোবাইলে সময় দেখে মৃদু স্বরে বলে, ‘মাসিমা, অনেকটা দূর চলে এসেছেন, আবার ফিরতে হবে। একদিনে এত হাঁটা আপনাদের উচিত নয়।’

‘কিন্তু ওরা কি ফিরতে চাইবে?’ অপর্ণার সংশয়। ‘বেশ তো দিদিরা বেড়ান, আপনারা ফিরে চলুন, রাস্তা হারাবার তো ব্যাপার নেই। একটাই পথ।’ ‘তবু ওদের বলে দিতে হবে আমরা ফিরছি।’ ‘অনি, বিনি,’ ‘মিলি,’ ‘রুমকি।’ নিভাননী, প্রতিভা, অপর্ণার বিফল প্রয়াস।

‘মাইজি হামি ডেকে আনছি।’ দেবদূতের মতো ছোট্টর মাটি ফুঁড়ে উদয়। সে যে আগাগোড়া ছায়ার মতো তাদের পিছন পিছন ছিল কেউ খেয়াল করেনি। এক দৌড়ে ওদের কাছে উপস্থিত ও সকলের অ্যাবাউট টার্ন।

‘এমা তোমরা টায়ার্ড হয়ে গেছ, না? সরি সরি, আমরা এত এক্সাইটেড হয়ে গিয়েছিলাম টাইমটা খেয়াল ছিল না।’ বিনির অনুতাপ প্রকাশ।

‘ও বাবা, দেখ কাণ্ড, দেড়টা বেজে গেছে যে। তোমাদের খাওয়ার টাইম—’

‘আরে ছাড়, বেড়াতে এসে অত টাইম রাখা যায় না।’

‘তাছাড়া কত দেরিতে ঢাবাতে খেলাম। চল এখন।’ দিদিকে

থামিয়ে দিয়ে অনি ফেরার রাস্তা ধরে।

‘ওই রাস্তায় গিয়ে কী হবে? ইতো রুমে যাবার রাস্তা। ইখন কি রুমে যাওয়া জরুরি? খানা খাবার টাইম হয়নি? বরং ওই রিসিপ্সন বিল্ডিং চলুন।’ দলে একমাত্র মরদ হিসেবে ছোট্ট যে শুধু মালকিনদের খেয়াল রাখছে তাই নয়, এরমধ্যে পুরো ‘বঙ্গলার গ্রামের’ ভূগোল তার আয়ত্ত করা হয়ে গেছে। দিব্যি অন্য রাস্তা দিয়ে সে শর্ট কাটে সেই প্রথম বাড়িটা অর্থাৎ রিসেপশান কাম লাউঞ্জ কাম ডাইনিং কটেজে নিয়ে এলো।

পৃথুলা ও মধ্যমার সহস্রা অভ্যর্থনা, ‘কী দিদিরা, মাসিমারা কেমন দেখলেন ‘বঙ্গলার গ্রাম’? আরও অনেক কিছু আছে। লাঞ্ছের পর দেখবেন। এখন খাবেন তো। বসে পড়ুন। একটু দেরি হবে। আমরা সব একেবারে বেড়েই আনি কিনা।’ আড় চোখে তিন বয়স্কার সাদা সিঁথির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা, ‘মাসিমারা সবাই আমিষ খাবেন তো?’

‘হ্যাঁ হ্যাঁ আমিষ খাবার তো বুকিঙের সময় বলে দিয়েছিলাম।’ মিলি বিরক্ত সুরে বলে।

‘আমরা তবু একবার জিজ্ঞাসা করে নিই। বয়স্কারা আছেন কিনা। বসুন বসুন। জলটল কিছু খাবেন? দেবো?’

‘এই যা, জলের বোতল সব বনলতায় পড়ে আছে।’ মিলি ও অনির সমস্বরে আক্ষেপ।

‘তাতে কী হয়েছে, জল তো আমাদেরই দেওয়ার কথা। আনছি।’ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সিল করা বড়ো দু’বোতল জল উপস্থিত।

‘একটা গেলাস হলে ভালো হয়। বোতল থেকে খাওয়া অসুবিধা।’

‘দিচ্ছি।’ থালায় বসানো আটখানা ঝকঝকে কাঁসার গেলাস হাজির।

‘আমার না খুব দেশের কথা মনে পড়ছে,’ নিভাননী খানিক বাদে বলেন।

‘এইটা পুরো বাজে কথা, মা। দ্যাশে সেসময় এরকম কমার্শিয়াল স্কেলে এতো বাঁধাকপি ফুলকপি ব্রোকলি টমাটোর ক্ষেত মোটেই ছিল না।’

‘না না। আমি ওরকম এক এক করে মেলাচ্ছি না। কিন্তু এই যে খোলা মেলা, গ্রামের মতো চারিদিক। এক তলা সব বাড়ি, মেয়েদের এই সাজপোশাক, পরিবেশ, কেন জানি দেশের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। আচ্ছা প্রতিভা, তোর কিছু মনে হচ্ছে না? তোরও হচ্ছে? এক অপর্ণা তো খুব ছোট ছিল ওর বোধ হয় মনে নেই।’

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে দু’হাতে দু’টি ঝকঝকে কাঁসার থালা হাতে পৃথুলার প্রবেশ, পিছনে মধ্যমার হাতে মস্ত কাঁসার থালায় বাটির সারি। নিভাননী আর প্রতিভার সামনে থালা দু’টি রেখে বাটি গুলো সার দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হলো।

‘বাপ রে, এ কী করেছেন এ যে জামাই আদর,’ সভয়ে সমবেত আত্ননাদ। থালার মাথায় বাটি বসিয়ে সাইজ করা ভাত, তলায় সারি দিয়ে ভাজাভুজি, করলা, পালংশাক, ছোট্টছোট্ট বড়ি,

বিরিবিরি করে কাটা আলু, লম্বা করে ফালি কাটা গোটা বেগুন। থালার বাইরে সার দিয়ে সাজানো বাটিতে ডাল, লাউঘন্ট, ফুল কপি আর কাতলা মাছের ঝোল, সর্ষেবাটা দিয়ে পার্শে, মুরগির মাংস, চাটনি।

‘কী বিশাল কাণ্ড, একেবারে জামাইঘণ্টার ভোজ। এত খাওয়া যায় নাকি। তুলুন তুলুন।’

‘না না মাসিমা আমাদের ‘বঙ্গলার গ্রামে’ এটাই রীতি। আমরা সবাইকেই এরকম ভাবে আপ্যায়ন করি। তা ছাড়া যা খাবেন সব ‘বঙ্গলার গ্রামে’র ফসল। বাইরের জিনিস বলতে শুধু ঢাল আর ডাল।’

তার কথা শেষ হতে না হতে আরও দু’টি থালা ও বাটির সম্ভার উপস্থিত। অন্য টেবিলে আট-প্লাস-এক ছোট্টর খাবার আসতে আসতে বেশ খানিকক্ষণ কেটে যায়।

‘তোমরা আরম্ভ করে দাও, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।’ অনি হুকুম করতে করতে এবারে আবার মধ্যমা নিঃশব্দে এসে খানিকটা করে গলানো গাওয়া ঘি ভাতের সামনে ঢেলে দিতে থাকে আর থালায় করে পৃথুলা এক রাশ কুচো মাছ ভাজা নিয়ে হাজির।

‘এটা আমাদের এখানকার স্পেশাল মাছ, খেয়েই দেখুন, কোথাও পাবেন না। মৌরলা মাছের মতো কিন্তু মৌরলা নয়।’

প্রতিভা বলেন, ‘কিছু মনে করবেন না একটা খালি থালা প্লিজ আনুন, যেগুলো খেতে পারবো না, তুলে রাখি। খাবার নষ্ট করা উচিত নয়।’

‘না না মাসিমা আস্তে আস্তে খান, ঠিক পারবেন, ওই অতটুকু তো ভাত—’

অনেক জোরাঙ্গুরিতে শেষে একটা থালা এলো, যে যা পারবে না তুলে রাখে। মায়া ইতস্তত করছে, নিভাননী বলেন, ‘তুমি ছেলে মানুষ, সব খাবে। কিছু তুলো না, খাও, আরও লাগলে চেও, তৃপ্তি করে খাও।’

এদিকে অনি ধমক দিচ্ছে, ‘আরে যা পারো খাও না, অত ভাবাবাবির কী আছে।’

ইংরিজিতে রুমকি যোগ করে, ‘খেলেও যা ঢাকা দিতে হবে, না খেলেও তাই দিতে হবে।’ প্র্যাক্টিকাল নির্দেশ।

‘তাই বলে অসভ্যের মতো গাণ্ডে পিণ্ডে গিলবো নাকি’, বিনির বিরক্ত টিপ্পনী, বৈরাগী বলে কথা।

অপর্ণা চুপ করেইছিলেন। এবার সন্তর্পণে মুরগির বাটিটা এক ধারে সরিয়ে রাখেন। তাঁর দেখাদেখি নিভাননী ও প্রতিভাও অপছন্দের বাটিগুলো সরালেন।

‘এক মিনিট। দিদিভাইরা তোমরা কেউ আমাদের গ্রুপ ছবি তুলে দিতে পারবে? সব স্টেট করে দিচ্ছি, খালি টিপবে।’

অতঃপর অনি ও মিলির যৌথ নির্দেশে দু’কোণ থেকে সকলের ছবি তোলা শুরু।

‘এই তোমরা ন্যাচারাল হও। ওরকম কাঠ হয়ে ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে থাকলে হবে! খাও, ভাত মাথো মুখে তোল। হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যস, শাটার। আবার, রিপিট। দেখি কেমন হলো? ফাইন। এবারে

উল্টো দিক থেকে।’ বেশ কয়েকটা ছবি তোলার পর অনি জানায় সে এডিট করে বিনি, মিলি আর রুমকির মোবাইলে ফরোয়ার্ড করে দেবে।

নিভাননী খেতে খেতে মোহিত। ‘ঠিক দেশের রান্নার মতো। কত কাল পরে গ্রামের রান্না খেলাম। এদের পাল্লায় পড়ে কত বিচিত্র খাদ্য যে খেতে হচ্ছে। যেমন ধর, এই বিরিয়ানি। অসহ্য। আর পারা যায় না। নকল জাফরান দেওয়া এত ভাত, এক পিস বুড়ো খাসির ছিবড়েওলা মাংস, বোমার মতো একটা জ্যোতি আলু। কী মোগলাইয়ের ছিরি।’

‘দিদি, তন্দুর ভুলে গেলে? আধপোড়া ওই ইয়া মোটা ব্রয়লার চিকেনের ঠ্যাং আর বিশাল নান, গলা দিয়ে যেন নামতে চায় না।’ প্রতিভার সংযোজন।

‘নইলে চাইনিজ। মিস্ত্রিড ফ্রায়েড রাইস আর চিলি চিকেনের গাছ গজিয়ে গেল পেটে।’ অপর্ণা ফোঁড়ন কাটে।

‘দেখেছিস দেখেছিস, এত বাইরে নিয়ে যাই, তবু বড়দের মন আর পাওয়া গেল না।’ অনি মিলি ও রুমকির সমবেত অভিযোগ। বিনি গভীর ভাবে বলে, ‘কেন মিলির লাস্ট জন্মদিনে আমাদের বঙ্গ আউটিং, বাঙ্গালি খাওয়া হলো, ভুলে গেলে?’

‘ওরে বাবা, মনে করাস না, পকেট একেবারে গড়ের মাঠ করে দিয়েছিল শুধু ডাব চিংড়ি আর ভাঁপা ইলিশে, বাপ রে।’ অনি আঁতকে ওঠে।

‘নলেন গুড়ের আইস ক্রিমটার দাম যোগ করিস।’ রুমকি কুটুস করে চিমটি কাটে।

‘আমাদের সময়ে কলকাতায় মিস্ট্রি দোকানে কচুরি আর ছোলার ডাল ছাড়া দিশি খাবার মানে ছিল পাইস হোটেল। তারপর হলো রাস্তায় ফুটপাথে সারি দিয়ে সস্তার ভাত ডাল তরকারি মাছ।’ প্রতিভার কথায় অপর্ণা যোগ করে।

‘কোনোটাই আমাদের মানে বাড়ির মেয়েদের জন্য ছিল না। এখন দিব্য পরিবার-সহ পাড়ায় পাড়ায় বাঙ্গালি খাবার খেতে যাওয়া হয়। দাম একেবারে গলা কাটা কেন? কী ব্যাপার বল দেখি।’ নিভাননী কৌতুহলী।

‘ক্লায়েন্টেলের ওপর ডিপেন্ড করে প্রাইসিং।’

‘আর লোকেশন বা পাড়া। সাউথে দামটা বেশি।’ মিলি আর অনি বাণিজ্যিক তথ্য পরিবেশনে এক্সপার্ট। কোনো ক্রমে খাওয়া শেষ করতে না করতে যখন আবার মধ্যমা থালার মধ্যে বাটি সাজিয়ে এসে বলল, ‘শেষ পাতে একটু মিস্তি মুখ করুন। পায়স খাবেন তো। আমাদের নিজেদের গোরুর দুধের।’

কোরাসে আর্থনাদ, ‘না না আর পারব না।’

এরা ছ’জন তিন বাটি ভাগ করে খেল। এক মাত্র মায়া এক বাটি আর ছোট দু’বাটি পায়স নিঃশেষ করে মান রাখল। এবারে সেই কলসী বেসিনে হাত ধুয়ে নতুন গামছায় মুছে, মধ্যমার এগিয়ে দেওয়া ভাজা মশলা একটু মুখে পুরে সকলের শেষ কথা, ‘নড়াচড়া করা যাচ্ছে না।’

‘আমরা সব এক একটা শিকার গোলা অজগর।’ অনির মন্তব্য

হাসতেও যেন কষ্ট। পৃথুলা এসে খাবারের গুণাগুণ জিজ্ঞাসা করলে সকলের এক বাক্যে আহা উহ। নিভাননী আবার তাঁর দেশের স্মৃতির কথা উল্লেখ করলেন।

‘যাক, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের গ্রামের রান্না আপনাদের বাংলাদেশের মতো জেনে ভালো লাগল।’

বাবা রে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গ ভার্সেস আপনাদের বাংলাদেশ! অনি আর মিলির প্রায় গালে হাত। পৃথুলা রীতিমতো ডিপ্লোম্যাটিক। ‘গ্রামে বেড়াতে এসে ঘরের মধ্যে বন্ধ থাকবেন কেন। এখানেই খোলা জায়গায় বিশ্রামের ব্যবস্থা আছে। ডান দিক দিয়ে যান, দেখবেন।’ মধ্যমা আর তব্বী পরামর্শ দেয়।

প্রথমে ফুলের মেলা। একটা মোরম ফেলা রাস্তার দু’ধারে, কোমর উচ্চতার সব ঝোপের মতো গাছে অজানা বেশ বড়ো সাদা ধপধপে কলকে আর তারার মিস্ত্রিচার সব ফুলের মেলা। কী ফুল কেউ নাম জানে না। শেষে একটা মাঠের মতো খালি জায়গায় সারি সারি আধ শোয়া হয়ে পা এলিয়ে দেবার মতো পাটা ফেলে তৈরি লম্বা এক একটি ন্যাড়া কাষ্ঠাসন। বেশ ঠাণ্ডা এখানে। মোটেই সুখপ্রদ মনে হলো না। সকলে এগোয়। তার পর দেখা যাচ্ছে বড়ো বড়ো ঝাঁকড়া গাছের সারি। হাঁ এগুলো চেনা যাচ্ছে, আম জাম কাঁঠাল সফেদা আরও কত কী। মিলি আর অনি মাঝখানের সরু মেঠো পথ দিয়ে আগে ভাগে এগিয়ে গেছে। প্রায় আবিষ্কারের আনন্দে তাদের চিংকার, ‘এসে দেখ।’ সকলে আসে, দেখে সামনে বিরাট একটি চারকোণা পুকুর, পাড় ধরে তাল গাছের সারি।

‘আরে এয়ে দেখছি একেবারে তালপুকুর।’ ‘বেশ গভীর মনে হচ্ছে। জল একেবারে টলটল করছে।’ ‘ভুড়ি কাটছে। মাছ আছে।’

‘থাকবেইতো। সেই সব মাছই আমরা একুনি খেলাম।’

নিভাননী একটু পিছিয়ে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

‘মা, তুমি কথাটথা বলছ না কেন, শরীর ঠিক আছে তো?’

অনিতার উদ্বিগ্ন প্রশ্ন। মাথা হেলিয়ে জানান ‘আছে।’

‘তাহলে এমন চুপচাপ হয়ে গেলে যে? ক্লান্ত?’ নিভাননী মাথা নাড়েন, না। তারপর একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, ‘চল ওই তক্তা গুলোতেই একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক।’

একে একে সকলে এসে সন্তুর্পণে কাষ্ঠাসনে গা এলিয়ে দেয়। একটু পরেই প্রায় সমস্তের মন্তব্য, ‘আরে মন্দ লাগছে না।’

‘এই যে মাথার দিকটা ঢালের মতো উঁচু তাই আরাম হচ্ছে,’ রুমকির ব্যাখ্যা। অনি দু’হাত ছড়ায়। ‘আঃ, কী আরাম।’

মিলি গান ধরে, ‘এমনই করেই যায় যদি দিন যাক না— অ—।’ ‘অনি যোগ দেয়, ‘মন উড়েছে উড়ুক না রে মেলে দিয়ে মনের পাখনা, যাক না—আ—’

প্রতিভা না বলে পারেন না, ‘হ্যাঁ, তাদের তো মন সব সময়ে খালি উড়ছে। আজকের দিনটুকু ছাড়া আর কিছুই নেই। সংসার করা নেই, স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থাকা নেই, ছেলেপুলের নাম নেই।’

‘আহ মা, আবার তুমি ভাঙা রেকর্ড বাজাতে শুরু করলে। এই জনেই—’ ‘শান্তি শান্তি, চুপ কেউ এখানে ঘর সংসারের কথা

বলবে না। বেড়াতে এসেছি।’ অনি-বিনির দ্বৈত কণ্ঠে শাসন।

‘থাক না, মেজদি। আমাদের দিনকাল তো আর নেই। এরা যেমন থাকলে সুখী হয়, থাকতে দাও। বয়স তো কারো কম নয়। কিছু করার নেই।’ মৃদু স্বরে অপর্ণা বোঝান।



নিভাননী একেবারে চুপচাপ। যেন কিছু কানেই যায়নি। খানিক ক্ষণ সকলেই নীরব। তারপর এক কোণ থেকে মায়া, যার অস্তিত্ব সকলে ভুলেই গিয়েছিল, আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে, ‘মাসিমা, শরীর ঠিক লাগছে তো, নাকি ঘরে গিয়ে বিছানায় একটু শুয়ে নেবেন?’

নিভাননী মাথা নাড়েন। না, এখানেই ঠিক আছেন। আরও খানিক ক্ষণ যায়। ছোটোরা মোবাইল খুলে সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে পড়ে। বড়দের চোখ বন্ধ। নিভাননী এক সময় মুখ খোলেন। খুব আস্তে আস্তে যেন নিজের মনে কথা বলছেন, কেউ শুনল কী না শুনল কিছু আসে যায় না।

‘এই পুকুরটা যেন ঠিক আমাদের দেশের বাড়ির পুষ্করিণী। ছব্বছ। সেখানেও মাছ ছিল। তখন তো ফ্রিজিটিজের বালাই ছিল না, গ্রামে প্রত্যেক দিন বাজারই-বা কোথায়। খেতের কাজের মুনিষ যারা থাকত সবাই জাল ফেলে মাছ ধরতে জানত। প্রতি দিন টাটকা মাছ। বড়ো মাছ ছোটো মাছ যা উঠত তাই খাওয়া হতো। মাচার লাউ-কুমড়ো কী কাঁচাকলা বেগুন পেঁপে খোড়। ঝুনো ডাব তো গাদা করে রাখা থাকত। ছাড়িয়ে নারকেল ভাঙা হতো প্রায় প্রতি দিন। মুড়ি নারকেল। কী রান্নায়। হিন্দুর বাড়িতে বেশিরভাগ মেয়েরাই থাকতাম। জোয়ান পুরুষ তো সব বাইরে, গাঁয়ে তাঁদের জমিজায়গা চাষবাস দেখা ছাড়া মাইনর স্কুল মাস্টারি বা ছোটো ডাক্তারখানা খুলে প্র্যাক্টিস বা দোকানদারি ছাড়া আর কাজ কী। পড়াশোনা শেখা মানেই গাঁয়ের বাইরে কাজ। তার পর রিটায়ার করে গ্রামে ফেরা। তবে আমাদের বাড়িতে অবশ্য সবাই ছিল। অনেক জমিজায়গা, ধান ছাড়া পাটচাষ হতো। আমাদের ওখানে সাদা পাট। কর্তারা নিজেরা না দেখলে চলে? এসব বিক্রির উপার্জনেই তো সংসার চলে। ঠাকুরদাদারা তিন ভাই, প্রত্যেকে ছেলে-মেয়েসহ কাছাকাছি থাকতেন। তাঁদেরও জমিজায়গা ছিল— ছিল এক-এক জনের ছেলে-মেয়েসহ পরিবার। মানে শুধু চৌধুরীদের তিনপুরুষেরই বিশাল এলাকা জুড়ে বসবাস। আমাদের পরিবারেই ঠাকুরদা-ঠাকুমা, বাবা-কাকারা মিলে কত জনের এক সঙ্গে খাওয়াদাওয়া। বিরাট হেঁশেল। প্রতিভা, তোরা তো বোধহয় এভাবে সবাই মিলে গ্রামে থাকিসনি?’

‘ছুটিছাটায় যেতাম। গ্রামে ভিটেটা ছিল, জমিজায়গা ছিল। তবে সব জগতিদের হেফাজতে,’ প্রতিভা উত্তর দেন। ‘দিদি যা

বললেন, আমাদের ওখানেও পড়াশোনা জানা পুরুষমানুষ সব বাইরে। আমার বড়ো জ্যেষ্ঠামশাই কলকাতায় চাকরি করতেন আর এক জন তো আরও দূরে সেই জামশেদপুরে, টাটা কোম্পানিতে। ঠাকুমা, ঠাকুরদা পার্টিশানের বহু বছর আগেই বড়ো ছেলের কাছে চলে গিয়েছিলেন। সঙ্গে করে ঠাকুমার আদরের বড়ো নাতি আর ঠাকুরদার নয়নমণি বড়ো নাতনিকেও নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি আর ছোটোভাই বরেন শুধু বাবা-মায়ের সঙ্গে গ্রামে থাকতাম। ওখানে কলকাতার মতো বাড়িতে ঝি-চাকর থাকত না। একটা বাসন মাজার ঝি ছিল। ব্যস, বাকি সব নিজেদের। মা রান্না তো করতেনই, সঙ্গে সব রান্নাঘরের কাজ, বাটনা বাটা থেকে নারকেল কোড়ানো, শাকসবজি কুটনো কোটা, উনোন ধরানো, নিকনো সব করতেন। আমি ঘরদোর মোছামুছি, সকলের কাপড়জামা কাচা, সেই দশবারো বছর বয়স থেকে করেছি। স্কুলে পড়তাম বলে ঘরের কাজ থেকে রেহাই ছিল না।’

‘বাবা, আমি হলে তো আর পড়তেই এনার্জি পেতাম না। কী টাফ লাইফ, ভাবা যায় না,’ রুমকির রায় দান। ‘তুমি যে অত ঘরের কাজ করেও স্কুলের চৌকাঠ ডিপ্লোমে পারলে সেটাই একটা কীর্তি!’ মিলি মাকে বাহবা দেয়।

‘আরে তখন সব মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের এক অবস্থা ছিল। ঘরের কাজ মেয়েদের করতাই হবে। বিয়ে হবে তো। জানিস, দেশে কোনো কোনো অঞ্চলে বিয়ে হয়ে নতুন বউ শ্বশুরবাড়িতে ঢুকতেই তাকে একটা জ্যান্ত শোলমাছ কাটতে দেওয়া হতো।’

‘কী ভয়ংকর। পুরো বর্বর।’ সকলের জানা, অনির শ্বশুরবাড়ি থেকে বিদায়ের অন্যতম কারণ। তার দুই বিবাহিত ননদের একদিন বাপের বাড়িতে দুপুরে খাবার কথা। তার বর সেই উপলক্ষ্যে বাজার থেকে এক কিলো জ্যান্ত কইমাছ নিয়ে এসেছিল এবং শাশুড়ি অনিকে কাটতে বলেছিলেন, রান্নাটা তিনিই করবেন। তখনি অনির এক বস্ত্রে স্বামীগৃহ ত্যাগ।

অপর্ণা যে চুপ করে আছেন কেউ খেয়াল করে না। ‘ছোটো, তুই কত বয়স থেকে কলকাতায় রে?’ প্রতিভার প্রশ্ন।

‘তা বছর পাঁচেক বয়স বোধহয়।’ ‘তোরা তাহলে আর দেশের কথা কিছু মনে নেই। অবশ্য মনে করেই-বা কী হবে। দেশে কি আর শান্তিস্থিতি ছিল। আমি তো বহু কণ্ঠে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম। রাস্তায় বেরোলেই মুসলমান ছেলের দল।’

‘উফ, তোমাদের এন্ত প্রেজুডিস, এই জনোই মুসলমানরা তোমাদের দেখতে পারত না।’ মিলি আর অনির যৌথ সেকুলার টিপ্পনী।

‘আহা, তোরা তো সেই পরিবেশ দেখিসনি, কিছুই জানিস না। বাড়ি থেকে স্কুলে হিন্দু মেয়েদের যাওয়াটাই সমস্যা। রাস্তায়, মোড়ে দাঁড়িয়ে মুসলমান ছেলেরা সব ইচ্ছে করে শুনিয়ে শুনিয়ে অসভ্য অশ্রাব্য কথা বলত। আশ্চর্য ব্যাপার হলো ওদের বোনেরা দিদিরা আমাদের সঙ্গে পড়ত, বাড়িতে আসা-যাওয়া করত, তারা সব চমৎকার মেয়ে ছিল। কত বন্ধু ছিল আমার, বিলকিস, সাযরা, ফতিমা, হাসিনা। এখনো কয়েকটা নাম মনে আছে। আমি তো

গান শিখতাম, বাবা বাড়িতে মাস্টার রেখে দিয়েছিলেন, অত ঘরের কাজ, পড়াশোনা, তার মধ্যেও বাবার খুব শখ ছিল আমি গান করি। আমার গলা নাকি যেমন মিষ্টি তেমন সুরেলা, সর্বদা বলতেন। স্কুলে সব অনুষ্ঠানে গাইতাম, রাগপ্রধান, কীর্তন, শ্যামা সঙ্গীত।

হ্যাঁ রে, বিশ্বাস হচ্ছে না, না? ওই মুসলমান মেয়েরাও খুব গান শুনতে ভালোবাসতো। ওদের বাড়িতে তো শিখতে দিত না। আমাদের বাড়ি এলেই আমাকে ওরা গান গাইতে বলত। আবার গলা মেলাতে চেষ্টা করত।

‘আচ্ছা, মাইমা, কখনো জিজ্ঞাসা করনি ওদের ভাই, দাদারা ওরকম অসভ্য কেন?’ বিনির প্রশ্ন।

‘করেছি। কতবার। সেই এক উত্তর। খুব লজ্জিতভাবে বলত, কিসু খারাপ ভাবিস না রে। হিন্দু মাইয়া দ্যাখলেই আমাগো মরদগুলার শরীর গরম হইয়া যায়। অরা কী করব। আল্লা দিসে অমন শরীর।’ এবারে একসঙ্গে উঠে বসে মিলি অনি বিনি রুমকি।

‘কি! হিন্দু মেয়ে দেখলে শরীর গরম হয়! শরীর কি হিন্দু-মুসলমানের আলাদা! ইয়ার্কি মারবার জায়গা পায়নি।’

‘তোমাদের ওখানে পুলিশ টুলিশ ছিল না? মগেরমুলুক নাকি?’

‘হ্যাঁ রে মগের মুলুকই বটে।’

‘শুনেছি ’৪৬ সালে নোয়াখালীতে হিন্দুদের ওপর প্রচণ্ড হামলার সময় বহু হিন্দু মেয়েকে রেপ করা হয়েছিল। তার পর বাঙ্গলার তখনকার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দি নাকি বলেছিল, হিন্দু মেয়েরা বেশি সুন্দর দেখতে, তাই রেপড হয়।’ নিভাননী আস্তে আস্তে যোগ করেন।

‘কী এক খানা দ্যাশ’, মিলি চৌট উল্টোয়। ‘তা মেজোমাইমা, তোমরা এসব সহ্য করে দ্যাশে ছিলে কেন?’

অনির প্রশ্নের উত্তরে প্রতিভা বলেন, ‘পেটের দায়ে। জ্যাঠামশাইরা দু’জন কলকাতা আর জামশেদপুরে ভালো চাকরিতে এস্টাব্লিশড। কিন্তু বাবা ছিলেন ডাক্তার, তাঁর চেম্বার দেশে, মানে ফরিদপুরের একটা শহরে। বাবার ডাক্তারিতে খুব পশার ছিল, সারা অঞ্চলের লোক চিকিৎসার জন্য আসত। ওষুধের দোকানও খুলেছিলেন। শহরের বাইরে পাঁচখানা গাঁ থেকেও লোকে ওষুধ কিনতে আসত, বাবার রোগীরা তো বটেই। ডাক্তারি সঙ্গে দোকানের রোজগার, এসব ছেড়ে কলকাতায় গিয়ে হঠাৎ কী করবেন। কলকাতায় কি ডাক্তারের অভাব? অবশ্য জ্যাঠারা ঠাকুরদা সমানে লিখছিলেন চলে আসতে।’ চুপ করে যান প্রতিভা।

‘তাহলে শেষে এলেন কেন?’ কোণ থেকে প্রশ্ন করে মায়া।

নিঃশ্বাস ফেলেন প্রতিভা। ‘শেষ পর্যন্ত সেই চলে আসতেই হলো। আমরা পঞ্চাশের দাঙ্গাও সহ্য করেছিলাম। আসলে সে আমলে বেশিরভাগ এলএমএফ পাশ করা ডাক্তার হতো, বাবা ছিলেন এমবিবিএস। তাই খুব খাতির ছিল। শহরের অনেক মধ্যবিত্ত মুসলমান বন্ধু ছিলেন। পরিবারের সকলের, আত্মীয় পরিজনের চিকিৎসা করাতেন। পঞ্চাশের সেই ভীষণ সময়ে তাঁরা

জোর করে বলেছিলেন, ‘এইটা হইলো আপনার চৌদ্দ পুরুষের ভিটা, ইন্ডিয়ায় ক্যান যাইবেন, আমরা কি পর? কিস্যু চিন্তা করবেন না। আপনারে, আপনার পুরা আমরা ফেমিলিরে প্রোটেকশান দিমু।’ দিয়েওছিলেন। সে সময়টা আমরা কোনোমতে কাটিয়ে দিতে পেরেছিলাম। কিন্তু পরিস্থিতি আর কোনো দিনই স্বাভাবিক হলো না। যে কোনো হিন্দু পূজা পার্বণ এলেই কিছু না কিছু অঘটন ঘটত। আমার মুসলমান বন্ধুরা প্রায়ই কথায় কথায় জানতে চায় কবে ইন্ডিয়া চলে যাব, অমুকে গেছে তমুকে গেছে। কয়েক বছরের মধ্যেই স্থানীয় একটি মুসলমান ছেলে ডাক্তার হলো। ঢাকাতে মেডিকাল কলেজে পোস্টেড। তার বাপ আফজল আলি ছিল ব্যবসায়ী, আমাদের খুব পরিচিত, আমরা ভাই-বোন আলিচাচা ডাকতাম। একদিন বাবাকে বলল, ‘ডাক্তারবাবু আপনি তো নিচ্চয় ইন্ডিয়া চইলা যাইবেন যাইবেন করতাসেন। তা যখন যাইবেন আমারে কইবেন, আপনার চ্যান্সার দুকান সব আমি কিন্যা নিমু। বাজার দরের চাইতে বেশিই পাইবেন।’

‘ছেলেকে এখানে বসাতে চান বুঝি?’ বাবা জানতে চান।

‘হঃ, ঢাকায় হাসপাতালে আর কয়টা ট্যাংক পায়। হেইখানে আপনার চ্যান্সারে বসলে আপনার পেশেন্টগুলো পাইব, দুকান তো আপনার লক্ষ্মী। পোলাটার শাদি দিসি, বালবাচ্চা হইব, আয় তো বাড়ইতে হইব, বোঝেন ত।’

অনেক বছরের পেশেন্ট ওদের, বাড়িসুদ্ধ লোক। এদিকে মা মাথা খেয়ে ফেলছিল বাবার, আমাকে কলকাতায় মানে ইন্ডিয়ায় বিয়ে দেওয়ার জন্য। পার্টিশানের পর কলকাতার পাত্র কেউ পূর্ববঙ্গের মেয়ে বিয়ে করে? ঠাকুরদা রাগ করে লিখলেন, ‘ফরিদপুরে প্রতিভার কী ভবিষ্যৎ ভাবিয়াছ কি?’ গড়িমসি করে করে শেষে বাবা ঠিক করলেন চেম্বার আর দোকান আগে বিক্রি করে তারপর এই বসতবাড়ি, সব শেষে গাঁয়ের ভিটে, জমিজায়গার ব্যবস্থা করবেন। তারপর কলকাতায় চলে যাওয়া হবে। ক’বছর হলো পাসপোর্ট ভিসা হয়েছে। সব মধ্যবিত্ত হিন্দু পরিবার সরিয়ে ফেলেছে। এবার আলি চাচাকে চেম্বার আর দোকান বিক্রির সিদ্ধান্তের কথা জানানেন বাবা। ‘এত দেরি করলেন ক্যান। অ্যাখুন তো আপনাগো জমিবাড়ির দাম অ্যাক্সেরে পইড়া গ্যাসে। জানেন তো আমাগো সংবিধান হইসে, আমরা পূর্ব পাকিস্তান হইসি, আর ইস্ট বেঙ্গল নই। আর সারা পাকিস্তান হইল গিয়া ইসলামিক রিপাবলিক। আপনারা হইলেন সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন। দ্যাশের কোনো বড়ো পোস্ট আপনারা পাইবেন না। ইসলামের বিরুদ্ধে টু শব্দটি করা চলবো না। ভোট আপনাগো আলাদা। এই অবস্থায় আর কত দাম পাইবেন।

‘মোট ৪০ হাজার টাকা চেম্বার আর দোকানের দাম ঠিক হলো, একবারে জলের দরে ছেড়ে দেওয়া। তাও সই। আলিচাচা একদিন দলিল তৈরি করে বাবাকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়ে নগদ টাকা ৪০ হাজার টাকা হাতে দিয়ে গেল।

সন্ধ্যাবেলা বাবা শেষবারের মতো চেম্বার থেকে ফিরে মায়ের হাতে টাকাটা দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে বাইরের ঘরে তাঁর ইজি



চেয়ারটাতে গা এলিয়ে বসেছেন। মুখ চোখ বসে গেছে। মন ভীষণ খারাপ। আর একটা চেয়ারে মা। পাশে চাদর ঢাকা তক্তাপোশে আমি আর বরেন, তার তখন বয়স বছর পনেরো, ক্লাস নাইনে পড়ে, তার ভবিষ্যৎও চিন্তার। এখন কলকাতার স্কুলের স্ট্যান্ডার্ড অনেক উঁচু, পারবে কিনা। সবাই বাবাকে বোঝাচ্ছি, মন খারাপ করে কী হবে, আমাদের তো আর কোনো উপায় ছিল না। রাত বাড়ে। আমরা খেতে বসব এমন সময় দরজায় জোরে কড়ানাড়া। বরেন খুলতেই ছড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ে আলিচাচা সঙ্গে জনা চারেক যণ্ডা মার্কা লোক। আমরা তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে গিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে দেখছি কী হয়।

বাবা বিস্মিত, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেন, ‘কী ব্যাপার, দলিলে কিছু অসুবিধা—’

‘না দলিল সব ঠিক আছে। অসুবিধা হইল নগদ ওই ৪০ হাজার টাকা। ওইটা ফিরাইয়া দিতে হইব।’

‘মানে, কী বলছেন, আপনি তো কিনেছেন, দাম তো আপনিই ঠিক করেছিলেন, ফেরানোর কথা উঠছে কেন?’ বাবা হতভম্ব।

‘ভালোয় ভালোয় দিয়া দ্যান, দেখতাসেন ত?’ বাকি সকলের হাতে এত বড় বড় খোলা ছুরি ঝক ঝক করে উঠল।

‘শোনেন আপনে মুসলমানের অনেক টাকা লইসেন, চপ্পের প্রেক্ষিপসন লিখ্যা, দাওয়া বেইচ্যা। আর ট্যাহা পাইবেন না। সকালে যা লইসেন, ফিরাইয়া দ্যান। যান, বাইর কইরা আনেন। নয়তো বিবি পোলা আছে না, আর জোয়ান মাইয়া? অ্যাদের দ্যাখতাসেন?’

‘চুপ করুন। দিচ্ছি।’ বাবা ভিতরে এসে মায়ের দিকে তাকাতেই মা নিঃশব্দে শোবার ঘর থেকে সিঁদুক খুলে টাকার বান্ডিলটা এনে দিলেন। বাবা নীরবে হাতে নিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে আলিচাচার হাতে দিলেন। গুণে নিয়ে কোনো কথা না বলে দলবল-সহ দরজা দিয়ে বেরতে গিয়ে থেমে দাঁড়ান। মুখ ফিরিয়ে বলেন, ‘শোনেন আবার থানায় গিয়া নালিশ করবেন না। আবশ্য কইরাও কিস্যু লাভ হইব না। ইংরাজের আইন কে মানে।? তা ছাড়া আমার লোকে নজর রাখতাসে। মনে থাকে যান।’ সদলে বেরিয়ে গেলে বাবা দরজা বন্ধ করে ভিতরে আসেন।

‘চল তাড়াতাড়ি খেয়ে নিই। আর এক রাতও এখানে থাকা নয়।’

আমরা হতভম্ব। মা কিন্তু নয়। আসলে পঞ্চাশ সালের পর হিন্দুরা বুঝে গিয়েছিল যেকোনো দিন চলে যেতে হবে।’

৫২ সালে পাসপোর্ট ভিসা চালু হতেই পাসপোর্ট আর একটা ইমার্জেন্সি প্ল্যান করে রাখা। কী কী সঙ্গে নেবে, কেমন করে নেবে। পাসপোর্ট, টাকাপয়সা সোনাদানা, সম্পত্তির দলিল, পরীক্ষার সার্টিফিকেট, দু’চারখানা জামাকাপড়। খাবার আর কারও গলা দিয়ে যেন নামছে না। মা বললেন, ‘তোমরা সবাই জোর করে করে খাও, এর পরে আর কখন নিজেদের বাড়িতে খেতে পারব কে জানে।’ নিজেই সব চেয়ে কম খেলেন। ‘যাই সব গোছগাছ সারি।’ হাতে করে যে টুকু আমরা বয়ে নিয়ে যেতে পারব। গয়নাগাটি আমাদের জামাকাপড়ের মধ্যে রুমাল লাগিয়ে পকেটের মত সেলাই করে ভরে নেওয়া হলো। নগদ টাকা বেশির ভাগ বাবার কাছে, কিছু কিছু আমাদের প্রত্যেকের কাছে, যদি অবস্থা গতিকে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। প্রত্যেকের কাছে কাগজের স্লিপে কলকাতার বাড়ির আর জামশেদপুরের ঠিকানা। তখন এত রকমের লাগেজ নেওয়ার মতো ব্যাগ স্টকেস হতেই না। সবাই মিলে বেরলে সেই স্টিলের ইয়া ভারী ট্রাংক বেরতো, বিছানাপতর সব হোল্ডলে নিতে হতো। তোরা তো সে সব দেখিসইনি।

‘আমি দেখছি, ছোটবেলায় সেই পুরী বেড়াতে যাওয়ার সময় বাস বিছানা নিতে হয়েছিল।’ বিনি সগর্বে জানাল।

প্রতিভা চুপ করে গিয়েছিলেন। কোণ থেকে মায়া আস্তে করে জিজ্ঞাসা করে, ‘তারপর কী হলো মাসিমা?’

‘বাবার ডাক্তারি ব্যাগটায় সকলের পাসপোর্ট, দরকারি দলিল, কাগজপত্র, পরীক্ষার সার্টিফিকেট সব প্যাক করা হলো। একটা ছোট অ্যাটাচি ছিল, তাতে সকলের একটা করে চেঞ্জ ঠাসাঠাসি করে ঢোকানো হলো। বাবা মাকে বললেন, গায়ের ভারী সোনার গয়না খুলে সঙ্গে নিয়ে নাও, যদি কিছু নেহাত পরতেই হয় একেবারে হালকা পর। আর শোন, হিন্দু বলে বিজ্ঞাপন দেওয়ার দরকার নেই, হাতের শাঁখা খুলে ফেল, কপালে সিঁদুরের টিপটাও মুছে দাও—’

‘কী যে বলো, আমি এয়োস্ত্রী হয়ে—,’

‘তুমি শাঁখাসিঁদুরে এয়োস্ত্রী নও, আমি বেঁচে থাকলেই তুমি সধবা থাকবে। নাও কথা বাড়িও না।’ মা চোখের জল মুছতে মুছতে ভিতরে গেলেন, আমি পিছন পিছন। কপালে টিপ ধুয়ে মা শাঁখা পলা সব খুলে সব উঠোনের মধ্যে তুলসীমঞ্চের মাটিতে পুঁতে দিলেন। নিজের হাতের মোটা বালা খুলে শুধু তিনগাছা চুরি আর লোহা বাঁধানো থাকল। তবে কানে গলায় একটু সোনা রইল। মধ্যবিত্ত হিন্দু বাড়ির মেয়েদের গায়ে সোনা না থাকলেই সন্দেহ করবে। গলার মোটা দড়ি হারটা খুলে রেখে সরু একটা গোট হার পরে নেন। সধবা নারীর তো গলা খালি রাখতে নেই। আর মায়ের গায়ে সোনা, এত বড় মেয়ের কান গলা খালি তো হতে পারে না। আমার হাতের চুরি দু’গাছা, কানে রিং আর গলায় সরু চেনটা

পরাই রইল।

‘আমরা রেডি,’ মা ঠাণ্ডা গলায় বললেন। রাত বারোটা। বাবা বললেন, এই মাঝ রাতে পরিবার নিয়ে বাইরে বেরলে পুলিশ টুলিশের নজর পড়বে। তা ছাড়া সব তো অন্ধকার, রাস্তায় চলাই দুষ্কর। একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাক। শুয়ে নাও। চারটে নাগাদ রওনা দেবো।’

মা আর বাবা শক্ত কাঠের মত শুয়ে, বুঝতে পারছিলাম এত টুকু তন্দ্রাও আসেনি। বরেন কিন্তু ভৌঁসভৌঁস করে ঘুমোচ্ছে। ‘ওরে তোরা ওঠ,’ আমারও কখন একটু চোখ লেগে এসেছিল, তাড়াতাড়ি উঠে বসি। দরজা জানালা যে কটা খোলা ছিল সব ভালো করে ঐঁটে, সদর দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হলো। মা বললেন, ‘এসো, সকলে তুলসীতলায় শেষ বারের মতো প্রণাম করি।’ করলাম। মায়ের দু’চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়ছে। বাবা আস্তে করে মায়ের পিঠে হাত রাখেন, ‘আমরা তো একসঙ্গে আছি। চল—।’

সবাই খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম। ভাগ্যিস দুটো কড়া ছিল, সদরের তালটা ওখানেই লাগানো হলো। অন্ধকার হলেও খুব অসুবিধা নেই, মা ছাড়া আমাদের তিনজনের মোটামুটি রাস্তাঘাট চেনা। যেতে হবে মাদারিপুর ঘাটে। অবশ্য অন্য ঘাটও ছিল। পূর্ববঙ্গে যাতায়াত মানে নদী পার হওয়া, খানিকটা বাসে, খানিকটা স্টিমারে, তার পর ট্রেনে। এখানকার মতো ছিল না। বেশিরভাগকেই কলকাতা যেতে হলে প্রথমে গোয়ালন্দ পৌছতে হতো। সেখানে আবার স্টিমারে করে পদ্মা পেরিয়ে স্টেশন থেকে যে যেখানে যাবার যেত। আমরা মাদারিপুরে থাকায় সুবিধা ছিল—আড়িয়াল খাঁ ধরে স্টিমারে একেবারে এখানকার ঘাট থেকে সোজা গোয়ালন্দ ঘাটে নামতে পারব। সেখানে ট্রেন ধরে পৌছাব কলকাতা। বাবা তো কথায় কথায় বলতেন ইংরেজদের দয়ায় স্টিমার লঞ্চ ট্রেন সব হয়েছে। আগে কী অবস্থা ছিল। নৌকায় শুধু সময় নয়, রোদে-জলে কষ্ট কত ছিল, আর সময় লাগার কথা তো ছেড়েই দাও। যাই হোক, আমরা তো হাঁটছি। নিঃশব্দে। সকলের মনে ভয়। আলিচাচা কি লোক লাগিয়ে রেখেছে? নজর রাখছে? পিছন পিছন কেউ আসছে না তো? আমাদের যাত্রার শুরু থেকে শেষ ভয় আর ভয়। মাদারিপুর ঘাটে ভয়। আলিচাচা যদি সত্যি ওই গুন্ডাদের আমাদের ওপরে নজরদারি করতে বলে থাকেন, ওরা তো প্রথমেই এখানে হাজির থাকবে। তারপর স্টিমারে সারাক্ষণ ভয়, সব তো মুসলমান মাঝিমাঝি, যাত্রীরাও বেশিরভাগ। আশ্চর্য, আজন্ম তো এদের সঙ্গে বাস করে এসেছি, নির্ভয়ে। এক সন্ধ্যায় সব বদলে গেল।’ চুপ করলেন প্রতিভা।

মায়া জিজ্ঞাসা করে, ‘তারপর?’

‘আড়িয়াল খাঁ নদী দিয়ে প্রচুর স্টিমার চলত। বাবা বলতেন পূর্ব বঙ্গে নদী গুলোকে কাজে লাগিয়ে জলপথে ব্রিটিশরা যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত করেছিল নিজেদের স্বার্থে। যেমন মাদারিপুর থেকে পাট, সোনালি আঁশ ছিল সোনার ফসল, যেত নারায়ণগঞ্জের পাটকল গুলোতে। কত টাকার কারবার ছিল। তবে

আমরা নেটিভরা সুবিধা পেতাম বইকী। পাটের ব্যবসা থেকে স্টিমার যাত্রা। আমাদের প্ল্যান স্টিমারে সোজা গোয়ালন্দ ঘাটে নামব। সেখান থেকে ঢাকা মেইল রাত এগারোটায় ছেড়ে পরদিন ভোর সাড়ে ছটায় শিয়ালদা পৌছায় বা চিটাগাং এক্সপ্রেস দুপুর ২টো ৩৫ মিনিট ছেড়ে শিয়ালদা পৌছবে রাত ১১টা ১৫য়। যেটা পাওয়া যায়।

শেষে আমরা ঢাকা মেইল ধরলাম। ভয়ে সারারাত চোখের পাতা এক করতে পারিনি। কিন্তু আমরা কি আর সোজা শিয়ালদা পৌছতে পারব? দর্শনা এখানকার বর্ডার, ওপারে গেদে হচ্ছে ভারত। আমরা তো ওখানকার বাস তুলে দিয়ে আসছি। রিফিউজি, যে নামটা শুনতে বাবা এতকাল চাননি। দর্শনাতে ট্রেন আটকে আমাদের সবাইকে নামানো হলো। সারি বেধে দাঁড় করিয়ে পুলিশ আর আনসার বাহিনীর চলল চেকিং। সে কী সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা। মনে করতেও চাই না। মেয়েদের শরীরে হাত দিয়ে গায়ের গয়না, বেশিরভাগের পেট, কাপড়ে লুকানো সোনা সব কেড়ে নিল, পুরুষদের কাছ থেকে টাকা পয়সা। কলকাতার সঙ্গে বহু দরকারে তো বরাবর যাতায়াত, হিন্দু-মুসলমান উভয়ের, বিশেষত হিন্দুদের। কাজেই বাবার গল্প হলো, ‘কলকাতায় নিকট আত্মীয়ের অসুখে দেখতে যাচ্ছি, সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে আসব, তাই জামাকাপড় বেশি নিইনি। আমরা পার্মানেন্টলি দেশ ছাড়ছি না।’ তাতে ভবি ভুলল না।

‘রোগী আত্মীয়ের দ্যাখতে যাইতাসেন সঙ্গে এত দলিল কাগজ ক্যান? ও, খালি বাড়িতে রাখতে ভরসা নাই! আর এমবিবিএস সার্টিফিকেটটা? পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট লইয়া কথা কইলে কইলকাতার ডাক্তার যদি না শোনে! জব্বর গল্পখান বানাইসেন। ঠিক আসে, যাইতে চান যান।’

মা চেকিং-য়ের সময় খুব সাহস করে বললেন, ‘আমি নিজেই সব গয়না দিয়া দিতাসি কারও গায়ে হাত দিবেন না।’ বলে আমাদের দু’জনের গায়ের সব গয়না খুলে ওদের হাতে দিলেন। পেট কাপড় উলটে দেখানো হলো, না, আর কিছু নেই। তবে মায়ের আর আমার সায়ায় সেলাই করা লুকানো গয়নাগুলো বেঁচে গেল। ভারতে ঢুকতে গেদেতে আর এক প্রস্থ চেকিং। তবে ওখানে সমবেদনা, সদ্যবহার। আমাদের নিজেদের লোক খোদ কলকাতায় আছে জেনে তারা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তাদের সাহায্যে শিয়ালদা শেষমেশ পৌছানো গেল।’

‘কলকাতায় এসে আপনি কলেজে পড়লেন? আর গানও নিশ্চয়ই শিখলেন।’ মায়ী আজ খুব কথা বলছে।

‘নারে, সে সব কিছুই হলো না। একা জ্যাঠামশায়ের ওপর আমাদের পুরো সংসার। চেষ্টার খুলতে হলে যে মূলধন লাগে সেটা কই। তাছাড়া ততদিনে বড়দির বিয়ের বয়স প্রায় পার হতে চলেছে। তাড়াহাড়ি বিয়ে দেওয়া দরকার। গয়না অন্তত লাগবে না। কিন্তু বাকি খরচ, আমাদের দু’বেলা খাওয়া-পরা। জ্যাঠামশাইয়ের চাকরিতে আর কতই-বা মাইনে, নিজের তিন মেয়েকে পার করতে হয়েছে, ছেলে ছোটো, তখনও পড়ে।

ঠাকুরদা-ঠাকুমা, দাদা-দিদি আবার তার মধ্যে আমরা চারজন গিয়ে পড়েছি। তিনতলা বাড়ির একতলায় তিনটি ঘরে একটি খোলা উঠানে বাস। একেবারে গিজিগিজি। আমাদের এরকম ঘেঁষাঘেঁষি করে বসবাস অভ্যাস ছিল না। খুব অসুবিধা হতে লাগল। শেষে যাদবপুরে রিফিউজি কলোনিতেই ঠাই নিতে হলো। বাবা কোমর বেঁধে লাগলেন পূর্ববঙ্গের সঙ্গে কারা কারবার করে তাদের সম্মানে। তখন কলকাতায় রিফিউজিদের নিজেদের বৃত্ত তৈরি হয়ে গেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তো কোনো উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের পরিকল্পনাই ছিল না। যে যেখানে পারে জবরদখল করে বসেছে, আর পাঁচটা উদ্বাস্তুকে বসতে সাহায্য করছে।

দু’চারজন মুসলমানের সম্মান পাওয়া গেল যারা হাওয়ালা মারফত ওপারের সঙ্গে লেন-দেন করে। আমাদের মতো কত সর্বস্ব ফেলে রেখে পালিয়ে আসা পরিবার ছিল তার ইয়ত্তা নেই। একজন করিতকর্মা এবং হেল্পফুল দালালের মারফত যেনতেন প্রকারে দেশের বাড়ি জমি একে একে বিক্রি হয়ে গেল। কতদূর আইনের মতে হলো কে জানে। কারণ সেগুলো তো সব এনেমি প্রপার্টি হয়ে যাওয়ার কথা। সে যাই হোক, মোদ্দা কথা বাবা হাতে কিছু টাকা পেলেন। দালালের কৃপায়। সব মুসলমান তো খারাপ নয়। হ্যাঁ, তারও লাভ হলো, সেতো স্বাভাবিক। এবারে কলোনির বাড়িটা পাকা করে, দিদির বিয়ে দেওয়া হলো। দাদার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার খরচ, বরেনের স্কুল, সকলের ব্যবস্থা করে আর আমার কপালে কিছু রইল না। ঘরের কাজেই সারাটা দিন কাটত।’

‘সেই ঘরের কাজে এক্সপার্ট ছিল বলেই তো আমাদের সংসারের হাল ফেরাতে পারলি।’ নিভাননী সান্ত্বনা দেন।

‘আমরাও তো রিফিউজি হয়ে কয়েক বছর আগে চলে এসেছিলাম। তুই যখন এলি তখন সংসারে কোনো ছিরিছাঁদ ছিল না। তুই লক্ষ্মীমন্ত বলেই শ্রী এলো।’

‘নোট কর নোট কর, ননদিনীর মুখে ভাদ্রবৌয়ের গুণগান,’ অনির জোর গলায় মন্তব্য। সমবেত হাস্য।



‘আচ্ছা, আপনারা কেন এলেন মাসিমা?’ আবার মায়ার প্রশ্ন। এই বাঙ্গলার গ্রামে এসে প্রত্যেকের ওই বাঙ্গলার গ্রাম ত্যাগের ইতিবৃত্ত শোনার তার ইচ্ছে হয়েছে, সুযোগ হয়েছে।

‘আর সে সব কথা মনে করতেও ইচ্ছা করে না, মনে করিও না।’

‘তবু, অন্তত কী ঘটেছিল সেটা একটু বলুন,’ মায়ী আজ নাছোড়বান্দা।’

‘জ্ঞান হওয়ার বয়স থেকেই বড়দের মুখে শুনতাম হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের কথা। কখনও ঢাকা, কখনো নোয়াখালী।

আসলে অনেক বছর ধরেই সারা পূর্ববঙ্গে এসব চলেছে, যেন হিন্দুদের জীবনে এটাই স্বাভাবিক। হিন্দুদের দোকানপাট, ঘরবাড়ি জ্বালানো, বাড়িতে, মন্দিরে গৃহদেবতা ভাঙচুর, বেশি শুনতাম। খুনজখম, ধর্ষণ, জোর করে কলমা পড়ানো আমাদের সামনে বড়রা প্রায়ই চেপে যেতেন। ছোটোরাও শুনতে শুনতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল, বন্যা বা দুর্যোগে যেমন লোকে অভ্যস্ত হয়ে যায়। প্রকৃতির মর্জি, মানুষের সহ্য করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। তার মধ্যে কিছু কিছু গ্রামেগঞ্জে শান্তির জীবন ছিল। যেমন আমাদের গ্রামে। অনেক মুসলমান আমাদের জমিতে খাটত, কিছু মধ্যবিত্ত স্কুল টিচার, সরকারি চাকুরে, সম্পন্ন ব্যবসায়ী মুসলমানও ছিল। তাদের সঙ্গে আমাদের দিব্যি ভালো সম্পর্ক। ছোটোকাকা দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, পড়াশোনায় মন, স্কুল মাস্টার হয়েছিলেন। তার বন্ধু ও কলিগ নাসিরুদ্দিনকে তো আমরা নাসির চাচা ডাকতাম। ওদের বাড়ির ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে আমাদের খুব ভাব। নাসির চাচার মেয়ে জিনত আর আমি ছিলাম হলায় গলায় বন্ধু। ছুটির দিনে পরস্পরের বাড়িতে যাতায়াত, এক সঙ্গে আদাড়েবাদাড়ে ঘুরে বেড়ানো, দস্যপনা, ওটা আমিই বেশি করতাম, ও মুগ্ধ দর্শক ছিল। ওর ওপরে আবদুল ভাই অন্য মুসলমান ছেলেদের মতো একেবারেই ছিল না। ঠিক আমাদের মাসতুতো খুড়তুতো ভাইদের মতো। ওর সঙ্গেও খুব ভাব ছিল। আমি বয়সের তুলনায় অনেকটা লম্বা, এদিকে ছেলেদের মতো দোড়াদোড়ি, এর গাছের আম, ওর গাছের পেয়ারা পেরে আনতে ওস্তাদ ছিলাম। আমার মতো তরতর করে গাছের চড়তে গাঁয়ে কোনো মেয়ে দূরের কথা কোনো ছেলেও পারত না। মা রাগ করে বলত, ‘তুই মাইয়া না বাঁদরী!’ আবদুল ভাই খেপাত, ‘ননী বাঁদরী ননী বাঁদরী!’

‘ওমা, পিসিমণি তুমি একেবারে টম বয় ছিলে’, রুমকির মন্তব্যে সমবেত হাস্য। ‘ওই বাঁদরী বল আর টম বয় বল, ওই জনেই তো সবাই রক্ষা পেল।’

‘কী করে? বলো বলো’।

‘আমার বয়স তখন কত, বছর চোদ্দ-পনেরো। বাড়িতে কিছুদিন ধরে সকলের মনমেজাজ খারাপ। একেতো স্বাধীনতার পর ইংরেজের শাসনে যেটুকু আইন শৃঙ্খলা ছিল তার জলাঞ্জলি হয়ে গেছে। তার ওপর ব্যবসায়ে ধাক্কা, কলকাতায় আর পাট পাঠানো যাচ্ছে না, পরিবারের প্রধান আয়ের সোর্সে টান। নতুন বাজার খুঁজতে হচ্ছে। তবু যাহোক ধান চালটা ছিল। এদিকে জমিদারি উচ্ছেদের কথা চলছে, আমরা তো খাতায়কলমে জমিদার নই। তবুও জমির আয়ে জীবনধারণ তো বটে। এর মধ্যে কোথায় জন্মান্তিমীতে কী বাধা পড়ল, কোথায় দুর্গাপূজা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে পোস্টার পড়েছে, কোথায় বিজয়ায় হিন্দু বাড়িতে হামলা হলো, ক’টা হিন্দু দোকান কোথায় পুড়ল ইত্যাদি খবর পাঁচকান হয়ে আসছে।

এই তো দু’মাস আগেই শুনেছিলাম কী তেভাগা না কি আন্দোলন করা কমিউনিস্ট ধরতে হিন্দু সাঁওতাল সব চাষিদের আর তাদের হিন্দু নেতাদের ওপর সাংঘাতিক মার চলছে। পুরো

গ্রাম ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে, কত মরল, কত কী হলো তার ঠিকঠিকানা নেই। বড়রা এ সব নিয়ে কথা বলে, আবার নিতাকর্মে লাগে। যেন যতক্ষণ একেবারে নিজেদের গায়ে না লাগছে ততক্ষণ সব আগের মতো চলবে। তাদের দেখাদেখি আমরা ছোটোরাও এসব শুনি কিন্তু মনে রাখি না।

কবে যেন শুনলাম আমাদের মৈমনসিং জেলাতেই কিশোরগঞ্জের ভৈরব বাজার আর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মধ্যে মেঘনার ওপর দিয়ে লম্বা ভৈরব ব্রিজের মাঝ খানে নাকি ট্রেন থামিয়ে প্রত্যেক কামরা থেকে বেছে বেছে ধুতি পরা দেখে হিন্দু বলে দা তরোয়াল সব দিয়ে কেটে নদীতে দেহ ফেলে দিয়েছে। যারা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কেটে পাড়ে উঠতে চেষ্টা করেছে, তাদের তীরে রেডি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মুসলমানরা পাথর ইট সব ছুড়ে ছুড়ে মেরেছে। হাজার হাজার হিন্দু মারা গেছে। খুনিরা প্ল্যান করে ভৈরব বাজার জংশন থেকেই ট্রেনে উঠে সব কামরায় ঢুকে বসেছিল। ট্রেন পুরো ব্রিজের ওপরে উঠে মাঝখানে আসতেই থেমে যায় আর তারা অ্যাকশান শুরু করে। পুরোটাই পরিকল্পিত গণহত্যা। না, গণহত্যা শব্দটা তখন শুনিনি, হাজারে হাজারে খুন শুধু শুনেছি। তবে ওটাতো হয়েছে কিশোরগঞ্জে, আমরা তো জামালপুর সদরের গ্রাম ফুলপুরে।

মা বলতে লাগলেন, ‘ননী আর যত্রতত্র ছাড়া গোরু হইয়া ঘুইরা বেড়াইবি না, তুই এখন বড় হইতাসস, তাছাড়া দিনকাল ভাল না,’

আমি এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দিয়ে যথারীতি ইস্কুল থেকে ফিরে দুটো মুখে দিয়ে ব্যস বাড়ি থেকে হাওয়া। তখন শীতকাল, বোধ হয় মাঘ মাসের শেষ। চমৎকার মিষ্টি রোদ, যা আরাম ঘুরে বেড়াতে। কিন্তু কারও বাগিচায় ফলফুলুরি নেই, এই যা মুশকিল শীতে। আমাকে দেখে জিনত ডাকে, ‘ননী আমাদের বাড়ি আয়, লুডো খেলুম। আবদুল ভাই ঘরে আছে, তুই তাকে হারাবি না?, আয়।’ আমার চেয়ে দু’তিন বছরের বড়, আবদুল ভাই ক্লাস নাইনে পড়ে, ভালো পড়াশুনা। আমার বই দেখলেই গায়ে জ্বর আসে বলে ধরে ধরে জ্ঞান দেয়, ‘ননী ল্যাখাপড়ারে মন দে, অঙ্ক আর ইংরাজি এই দুইটা মেইন, বোঝবি? ভাল কইরা পড়বি।’ উফ। তাছাড়া ‘বাঁদরী বাঁদরী’ বলে খেপায়। সব মিলিয়ে আমার ভীষণ রাগ। আজ লুডোতে দেখে নেবো।

ওদের বাড়িতেও আলাদা আলাদা অনেক ঘর, আমাদের মতো বাবা-কাকা-জ্যাঠারা এক সঙ্গে থাকে। সামনে আবদুল আর রফিকের ঘরে শতরঞ্চি বিছিয়ে আমি জিনত, ওর চাচাতো বোন রেহানা আর আবদুলভাই লুডো নিয়ে বসি। কিন্তু জিততে পারছি কই। গাছে উঠতে, দৌড়াতে আমি চ্যাম্পিয়ন কিন্তু লুডোয় লবডঙ্কা। ওটাতে আবদুলভাই চ্যাম্পিয়ন। দু’টো গেমে হেরে প্রচণ্ড মেজাজ খারাপ, এইবার হারাতেই হবে। তাড়া আছে, শীতের বেলা, অন্ধকার বল। বাড়ি ফিরতে হবে।

গুটি ঠিক করতে না করতে বাইরের দিকের দরজা ছড়মুড়

করে খুলে পাঁচ ছ'জন ছোকরা ঢুকে পড়ে। একটা ওদের চাচার ছেলে হামিদ, বাকিরা অচেনা। 'আরে আরে, এখানে ক্যান? কী করেন কী, আমরা মাইয়ারা আছি,' বলে জিনত উঠে দাঁড়ায়। আমরা সবাই উঠে পড়ি।

'হেইটা ওই চৌধুরী বাড়ির মাইয়া না?' হামিদ বলে। 'হিন্দুর মাইয়াটার লগে বইস্যা তরা কী করতাসস, অঁয়া?' বাকিরা একযোগে 'হিন্দুর মাইয়া হিন্দুর মাইয়া' করতে থাকে। জিনত আর রেহানা দৌড়ে ভিতরে চলে যায়। আমি কোণের দিকে বসেছিলাম। খানিকটা হতভম্ব হয়ে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াই।

'শরীরটা দ্যাখ, লম্বাচওড়ায় জব্বর হইসে, খালি রংটা আর মুখটা আল্লা দেন নাই। হা-হা-হা।' আর একজন বলে, 'আরে গায়ের রং, রূপ এ সব দিয়া কী হইব। আসল জিনিস ঠিক আসে', বলতে বলতে খপ করে আমার হাত ধরে।

'আই কী বেত্তমাজি করতাসস?' বলতে বলতে আবদুলভাই বাঁপিয়ে পড়ে। ততক্ষণে আমিও এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়েছি।

'খবরদার, অর গায়ে হাত দিবা না।'

'ক্যান তোর অ্যাত দরদ ক্যান? মাস্টার বাপের পোলা খালি বইখাতা জানস, হিন্দুদের লাখান। খবর রাখিস, কইলকাতায় হিন্দুরা কী করতাসে? আমাগো ফজলুল হক, শের-এ-বাঙ্গালরে কাইটা ফেলাইসে, আর তুই হিন্দু মাইয়ার সাথে রঙ্গরস করিস? তুই না মোছলমানের পোলা?'

ফজলুল হকটা আবার কে। নাম বোধ হয় শুনেছি শুনেছি। আমি কিছু বলার চেষ্টা করার আগেই আবদুল বলে ওঠে, 'যা যা বাজে গুজব। আর সইত্য হইলেও তাতে আমাগো হিন্দুদের কী দোষ? এই হামিদ, এরা কারা?'

'এরা সব আমাগো ফৌজ, কাল আনসার বাহিনী আইব, এই ফুলপুরে অ্যাকশান শুরু হইব। আশপাশে কত গ্রামে অ্যাকশান শুরু হইয়া গ্যাসে, জানস না? লক্ষ্মণপুর, সাপমারি,'

'আরে কাল ক্যান, আইজ অ্যাখুনি শুরু কইর্যা দেই। অ্যাই মাইয়াটারে দিয়া।'

'খবরদার তোমরা আগাইবা না। অর আব্বুরে আমি চাচা ডাকি, অরে আমি অ্যাতটুকা বয়স থিক্যা জানি, আমার ছুট বইনের লাখান।

'চাচা ডাকস! চাচা আপন চাচি পর, চাচির মাইয়া শাদি কর। হক্কেল মিল্যা করুম, তরেও ভাগ দিমু। হা-হা-হা।'

ওরা এগিয়ে আসার আগেই আবদুলভাই এক ধাক্কায় আমাকে বাইরের দরজার সামনে ঠেলে দিয়ে চাপা গলায় বলে, 'পালা, ননী, খুব জোরে দৌড়া, পালা।'

আমার ততক্ষণে ঝঁশ পুরো এসে গেছে। এক লাফে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আমি ছুটতে শুরু করি। পিছন পিছন আবদুলের চিৎকার শুনি, 'না, আমি কপাট ছাড়ুম না, ননীর গায়ে হাত লাগাইতে দিমু না।'

পালটা চিৎকার, 'হালার পো হালা, বেইমান, হিন্দুর হইয়া

লড়স! তর কলিজার এত জোর! দখ তোর পিরিতের কী করি।' আর্তনাদ ভেসে আসে 'আল্লা আল্লা!'

আবদুল ভাইয়ের গলা, না! থমকে যেতে গিয়ে সামলে নিই। আমাকে বাঁচাবার জন্য দরজা আগলেছে আবদুল ভাই। আমাকে বাঁচতেই হবে। কিন্তু সামনে বিশাল মাঠ, এখনো আবছা আলো আছে, এতগুলো জোয়ান মরদ যদি পিছু নেয়! বাঁ-দিকে সাহাদের মস্ত ফলের বাগান। গ্রীষ্মকালে আমি কত আম জাম পেয়েছি। সাঁ করে ঢুকে যাই। এখানে বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। একটু ভিতরে গিয়ে একটা বড় মতো গাছ বেছে চড়তে শুরু করি। যতটা পারা যায় ওপরে উঠে বসি।

এতক্ষণে হাঁফ ছাড়া গেল। চারিদিকে তাকাই। এখানে থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে মাঠের ওদিকে আবদুলদের বাড়ি দেখা যাচ্ছে বটে কিন্তু কী হচ্ছে না হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। আবছা চীৎকার চোঁচামেচি ভেসে আসে। বাইরে চারিদিক নিস্তব্ধ বলেই বোধ হয় এত দূর থেকে শুনতে পাই। মাঠে কিছু লোক, না? হাতে লণ্ঠন উঁচু করে কী দেখছে। আমাকে খুঁজছে। আমি আরও গাছের ডালের পাতার সঙ্গে মিশে যেতে চেষ্টা করি। না, এদিকে আসছে না। খালি মাঠে খোঁজাখুঁজি করছে। আস্তে আস্তে সব নিস্তব্ধ আর অন্ধকার হয়ে যায়।

কতক্ষণ বসেছিলাম জানি না। শেষে ঘুম পেতে লাগল। সাবধানে নেমে বাগিচার বাইরে আসি। বোধ হয় কৃষ্ণপক্ষ, কিছু দেখা যাচ্ছে না। দূরে জিনতদের বাড়ি থেকে মিট মিটে আলো আসছে, কিন্তু তেমন কোনো সাড়া শব্দ নেই। আমি বাগিচা থেকে বেরিয়ে ধার ঘেঁষে চলি, দরকার হলে ফট করে ভিতরে ঢুকে যাব। পাড়াবেড়ানি বলে গ্রামের মাঠঘাট রাস্তা সব নখদর্পণে। তাই সাবধানে মাঠঘাট পেরিয়ে অন্ধকারে প্রায় হাতড়ে হাতড়ে বাড়ি পৌছতে পারলাম। পৌছে দেখি এক কাণ্ড, রাত নটা বাজে, আমার এত দেরি দেখে খোঁজাখুঁজি করতে লোকে বেরিয়ে পড়েছে। আমি ঢুকতেই মায়ের গর্জন, 'আইজ তরে আমি কাইটা ফ্যলাইমু, জোয়ান মাইয়া মাঝ রাইত কইরা বাড়ি ফেরস।' ঠাকুমা মাঝখানে পড়েন, 'আহা, ঘটনা কী আগে শুনবার লাগব।'

বাড়িসুদ্ধ লোক আমাকে ঘিরে বসে আমার বৃত্তান্ত শোনে। ঠাকুর্দা-বাবা-কাকারা সব শুনে আলোচনায় বসেন। দু'মাস হলো সেই যে হিন্দুরা কমিউনিস্ট, তেভাগার লিডার বলে মারদাঙ্গা শুরু হয়েছে, তারপর থেকে নিত্যানতুন গুজবের বাহানায় লুঠপাট, খুনজখম, মেয়েদের ওপর অত্যাচার, ঠাকুরদেবতা ভাঙচুর, কুর্কাজ আর কত কী চলছে।

'সারা পূর্ববঙ্গ ধরেই চলতাসে সেই '৪৬ সাল থিক্কা। ইংরেজ তাড়ইয়া কী ভুল করলাম—' মেজকাকার মন্তব্য।

'আরে '৪৬ নয়, সেই ১৯০৫ সালের পর থিক্কাই নিশ্চিত্তে আর কখন থাইকতে পারলাম। যেই এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইল ব্যস এক্কেরে মাথায় চইড়া বসল।'

ঠাকুর্দার বিলাপ বাবা থামিয়ে দিয়ে বলেন, 'এখন হেইসব বেকার কথা রাখেন, শিরে সংক্রান্তি। প্রাণ মান ধন সব যাইতে

বসছে। কী করন সেইটা স্থির করেন।’ আলোচনায় ঠিক হল, বাবা, মেজ ও সেজকাকা স্ত্রী ছেলেপুলে নিয়ে এখনই দেশ ছেড়ে কলকাতায় চলে যাবেন। তখনো পাসপোর্ট হয়নি, বাবাদের পারমিট ছিল যাতায়াতের, ব্যবসার জন্য করানো ছিল। ঠাকুরদা ঠাকুমার এ বয়সে এ ভাবে তাড়াহুড়ো করে যাওয়া পোষাবে না, তাছাড়া তাঁরা চৌদ্দ পুরুষের ভিটেতে মরবেন স্থির করেছেন। ছোটো কাকা দেশ ছাড়তে রাজি নন, তিনি শেষ পর্যন্ত দেখবেন। তাঁর মতে হিন্দু-মুসলমান শতশত বছর পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করে এসেছে, এখন যেটা হচ্ছে সেটা স্রেফ রাজনীতি, বেশিদিন চলতে পারে না, একদিন না একদিন শুভবুদ্ধির উদয় হবেই হবে। তাছাড়া তিনি তো অবিবাহিত, স্ত্রী-কন্যার সমস্যা নেই। বরং বাবা-মাকে দেখার জন্য রয়ে গেলে সকলের মঙ্গল। মেজসেজ ঠাকুরদাদের কিছু বলা হল না, কারণ দু’বাড়িতেই নাকি কেউ কেউ পলিটিক্স করে। ছোটো কাকা সুবিধামতো পরে জানাবেন।

অতএব আমাদের যাওয়ার প্রস্তুতি। সঙ্গে ওই প্রতিভা যা বলল, যা আমরা নিজেরা বইতে পারি। এমন সামান্য কিছু নিয়ে রাত্রিশেষে রওনা। কলকাতায় কোথায় উঠব? আমাদেরই গ্রামের ঘোষবাড়ির হরেন্দ্রনাথ, আমাদের হরেন জ্যাঠা ছিল বাবার ছোটোবেলার বন্ধু। হরেন জ্যাঠা পড়াশোনায় ভালো ছিলেন, কলকাতার কলেজে পড়ে পাশাটাস করে সরকারি চাকরি করেন। তাঁর ঠিকানা আছে। প্রথমে সেখানেই উঠে তারপর একটা ব্যবস্থা। আসলে হরেন জ্যাঠার ভরসাতেই আমাদের দেশ ছাড়ার প্ল্যান করা হলো। তবে কারবারের সূত্রে কিছু চেনাজানা ছিল, দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজনও ছিল, তবে কলকাতায় নয়।’

‘অ্যাত পুরুষের অ্যাত জমিজায়গা, কারবার। আর আমার পোলারা হইব উদ্বাস্ত, রিফিউজি। ভগবান এও তুমি আমার অদৃষ্টে লিখসিলা।’ ঠাকুরদার শেষ কথা।

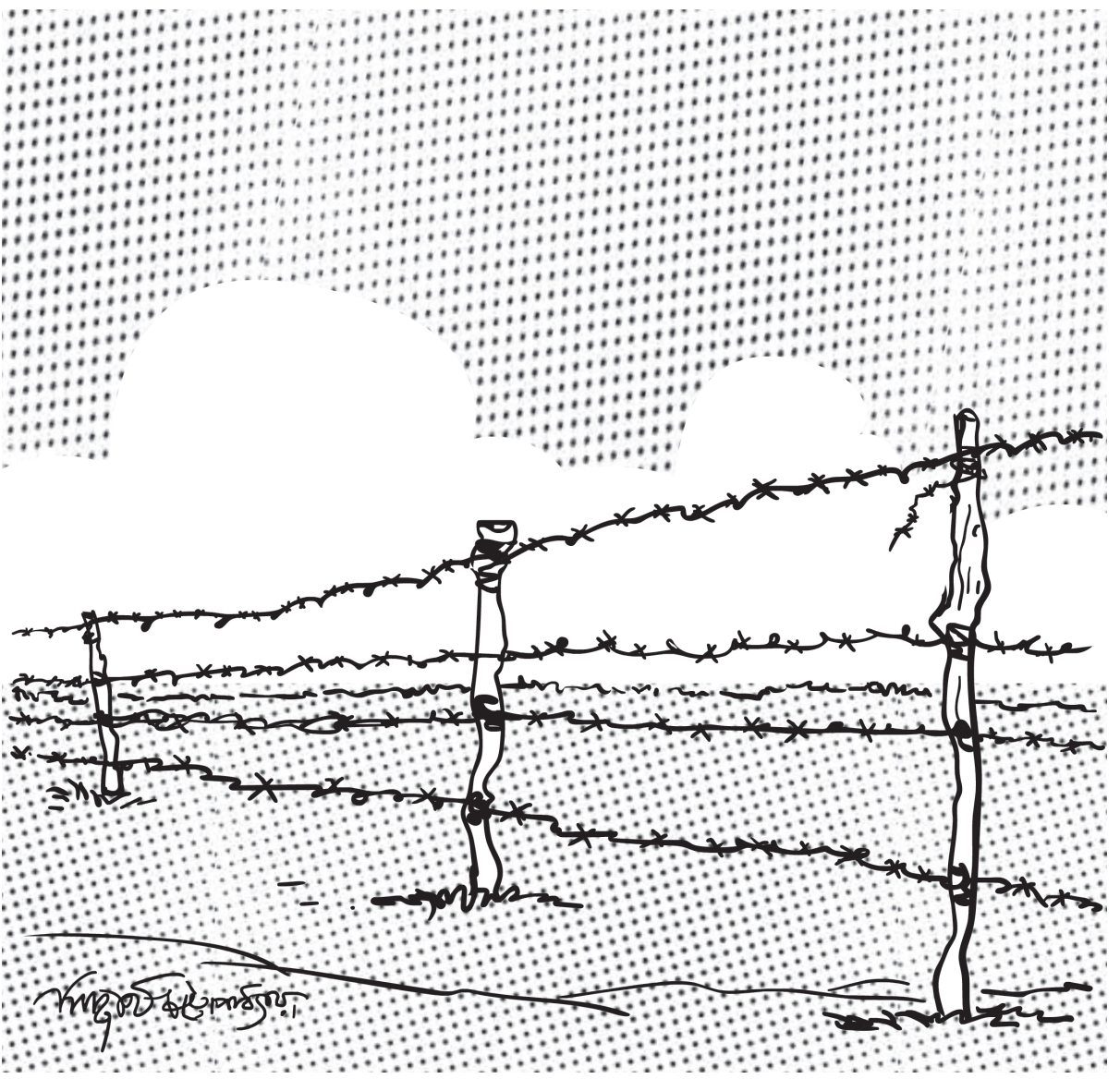
নিভাননী চুপ করলেন। সকলেই চুপ। মায়া জিজ্ঞাসা করে, ‘তারপর কী করে পৌছালেন এখানে।’

‘আর কী করে। ওই মেজো যা বলল। মোটামুটি এক গল্প। তবে পার্থক্য হলো সেটা ৫০ সাল, চারিদিকে হিন্দু খেদানো চলছে, আমরা জামালপুর সদরে যেতেই দলে দলে সঙ্গী পেলাম। তবে যাওয়া তো সহজ ছিল না। গ্রামে তো সব দাঙ্গাবাজ এসে গেছে। তাই শেষ রাতে চুপিচুপি পায়ে হেঁটে ছাড়তে হলো। গাঁয়ের সীমানার বাইরে এসে তারপর দুটো বলদ গাড়ি নেওয়া হলো। প্রথমে সদর। সেখানে থেকে সরিষাবাড়ির জগন্নাথ ঘাটে যমুনানদী, রেল স্টিমার ফেরিতে পেরিয়ে সিরাজগঞ্জ, সেখানে ঈশ্বরদি রেলস্টেশনে। ঈশ্বরদির নাম শুনেছিস? পাবনা জেলায়। সেখান থেকে ইস্ট বেঙ্গল মেইল ধরে রাণাঘাট হয়ে শিয়ালদা।

সর্বত্র সাংঘাতিক ভিড়। হাজার নয়, লাখ লাখ হিন্দু পূর্ববঙ্গ ছাড়ছিল। এমন জেলা ছিল না যেখান থেকে হিন্দুরা সব ছেড়ে দিয়ে শুধু প্রাণটুকু নিয়ে পালাচ্ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের বিধান রায়ও উদ্বাস্তদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। কাজেই রাণাঘাটে আমাদের তেমন

কোনো অসুবিধা হয়নি। হলো কলকাতায় পৌছাবার পর। নেহরু থেকে বিধান রায় কারও কোনো প্ল্যান ছিল না কীভাবে এই লক্ষ লক্ষ মানুষের থইথান হবে। ফলে যে যেখানে পেরেছে জবর দখল করে থাকতে বাধ্য হয়েছে। যেমন এই যাদবপুরে। তখন এটা শহরের প্রান্ত ছিল। ওখানে বিশ্বযুদ্ধের সময় মিলিটারিরা থাকত। যুদ্ধ শেষ হবার পর সৈন্যদের ব্যারাক খালি পড়ে ছিল। ১৯৪৭ সালেই উদ্বাস্তরা ওখানে গিয়ে বসল। পরে সরকার তাদের উৎখাত করতে চাইলে সবাই মিলে এমন লড়াই করল যে সরকার পিছু হটতে বাধ্য হলো আর জমি সব উদ্বাস্তদের নামে হয়ে গেল। তাই তো আমাদের এলাকার নাম বিজয়গড়। বাবারাও ওখানেই বাসা করলেন, প্রথমে কোনো মতে টিনের চাল, এক তলা। তারপর পাকা বাড়ি। আস্তে ধীরে মেজকাকা সেজকাকা কাছাকাছি বাড়ি করেন। আমরা যখন আসি তখন ওখানে ইস্কুল হয়ে গেছে। আমি কিছুদিন পড়েছিলাম। মন ছিল না। ম্যাট্রিকটা কোনো ক্রমে পার করা। বাবার বন্ধু হরেন জ্যাঠার কথা বলেছিলাম যিনি সরকারি চাকরি করতেন, ওঁর ওখানেই প্রথমে আমরা এত লোক উঠেছিলাম। ওঁর পরামর্শেই বিজয়গড়ে আসা, থাকা সব, ‘এখন জায়গা দখল না করলে পরে আর পাইবা না।’ তাঁর ছেলেই তাদের পিসেমশাই। হ্যাঁ উনি এম.কম. পাশ ছিলেন, আর আমি ম্যাট্রিক, তারপর চেহারা তো এই। তখনকার দিনে গ্রামসূত্রে সম্পর্কের, বন্ধুত্বের খুব দাম ছিল। সরকারের কোনো ট্যাক্সের ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন। কাজের সূত্রেই অনেক জানাশোনা ছিল। সেই কানেকশানেই বাবাদের ব্যাবসাটাবসা শুরু করতে সুবিধা হলো। তবে পাটের কারবারের সুবাদের কিছু নিজেদেরও জানাশোনা ছিল। ছোটখাটো কন্ট্রাক্টরি, মাল সাপ্লাইটাপ্লাই দিয়ে শুরু। খুব পরিশ্রম করতে হয়ে ছিল, ওঁরা তো কলকাতার বাজারের কিছুই জানতেন না। তবে ব্যবসার ধারা তো পরিবারে ছিল। তাই কিছু করতে পারলেন। হরেন জ্যাঠা প্রচুর সাহায্য করেছিলেন। আমার ভাইয়েরা কলেজের লেখাপড়া শেষ করেছে, সবাই সায়েন্স পড়ত। তখনো ক’টা বিলাতি কোম্পানি ছিল, সেখানে চাকরিও করেছে। বড় কিছু নয়। তাই ছেড়ে দিয়ে ব্যবসাতেই লাগল। ওই কী সব বলে, কোম্পানির সব ডিলার না কি। প্রতিভা তার আগেই ঘরে এসেছে, তখন খুব টান টান অবস্থা। বাবা-কাকারা সবাই এক ছাদের তলায়। খুব খাটুনি গেছে ওর। তারপর অবস্থা একটু ফিরলে আস্তে আস্তে সব ভিন্ন হলো। ওই যাদবপুরেই প্রথমে মেজ কাকা ও পরে সেজ কাকা ভিন্ন জায়গায় বাড়ি করল। তারপর এক বাড়িতে তাদের ছেলেরা দোতলা তিনতলা তুলে ভিন্ন হলো। এখন যার যার তার তার। আমরা সব এখানকার মতো হয়ে গেলাম। দেশের ভাষা কবে ছেড়ে দিলাম মনেও নেই। মানসিকতাও ছাড়লাম। কারও আর পাঁচ-ছ’টা ছেলেপুলে নেই। আমার তিনটে, ভাইদের দুটো করে, সব এম.এ. পর্যন্ত পড়েছে। মিলি আর রুমকিকে তো ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ানো হয়েছে।’

‘আচ্ছা মাসিমা, দেশে যে ঠাকুরদা, ঠাকুমা, ছোটোকাকা রয়ে



গেলেন, তাঁদের কী হলো? আপনারা আসার পর দিন যে অ্যাকশান হবার ছিল?’

নিভাননী চুপ করে থাকেন। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, ‘হ্যাঁ অ্যাটাক হয়েছিল, আনসাররা গাঁয়ের গুন্ডাদের সঙ্গে নিয়ে এসে বাড়িতে ঢুকে সব আসবাবপত্র, ঠাকুরঘর ভেঙে চুরে দিয়ে গোলায় আগুন জ্বালিয়ে দেয়। আর অশ্রাব্য গালিগালাজ, দুইটা গুটকা বুইড়া-বুড়িকে রাইখ্যা জোয়ানরা পালাইসে। এগুলোতে মাইরাও সুখ নাই। ছোটোকাকাকে বেদম পিটছিল, ওই হামিদ, রেহানার চাচাতো ভাই, ও বাঁচায়,’

‘পরানটা রাখ, কামে দিব। হালার পো মালাউন অঙ্কের মাস্টার। আমাগো পোলাগুলোতে শিখাইব।’

‘মেজসেজ ঠাকুরদাদের, বাকি গ্রামের কী হলো?’

‘শোন, এসব আর জিজ্ঞাসা করিস না। মনে করতে ইচ্ছা করে না। আর পাঁচটা হিন্দুর যা হয়েছিল তাই হলো।’ কিছুক্ষণ নীরবতা।

এবার মায়ার প্রশ্ন, ‘আচ্ছা মাসিমা, সেই যে আপনার আবদুল ভাই যে আপনাকে বলতে গেলে বাঁচাল, তার কী হলো কোনো খবর পরে পেলেন?’

নিভাননী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, ‘হ্যাঁ। পরে

ছোটোকাকার চিঠিতে জানতে পারি আবদুল কপাট দু’হাতে আগলে দাঁড়িয়েছিল বলে হামিদের দলবল মেরে ওর দুটো হাতই ভেঙে দিয়েছিল। ডান হাত কোনোক্রমে কাজ চলার মতো হয়েছিল, বাঁ হাতটা হয়নি। তখন তো ডামাডোল চলছে। ঠিক মতো চিকিৎসা পায়নি। ডাক্তার বেশিরভাগ হিন্দু, তারা চলে যাচ্ছে। চিকিৎসা, লেখাপড়া সব কিছুই বিশৃঙ্খল অবস্থা। তবে ওই অবস্থাতেই আবদুল ভাই পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছিল। ছোটোকাকাই নিজে যত্ন নিয়ে পড়িয়েছিলেন। পরে ওই স্কুলেই টিচার হয়েছিল।’

‘উনি রয়ে গেলেন, না? ওর ছেলেমেয়ে আছে?’ নিভাননী নিরুত্তর।

বেশ কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলেন, ‘ছোটোকাকা বিয়ে করেননি। ঠাকুরদা-ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর গ্রামে রামঠাকুরের আশ্রম করেছিল। না না, এই রামঠাকুর রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র নন। দেশে এক জন রামঠাকুর ছিলেন। ঐর জন্ম ফরিদপুরে, নোয়াখালীতে প্রধান আশ্রম ছিল। পূর্ববঙ্গে তাঁর ভক্ত চারিদিকে। ছোটোকাকা গ্রামে তাঁর আশ্রম খুলেছিল। স্কুলের পর ওখানেই থাকত। কিছু ভক্তও আসত, সম্ভ্রায় রামঠাকুরের নাম গান হতো।

শোন, আমাদের যাদবপুরেও রামঠাকুরের আশ্রম আছে, কৈবল্যধাম।’

‘তারপর?’ নিভাননী চুপ করে থাকেন।

মায়া আবার বলে, ‘তারপর?’ ‘তারপর আর কী।’ ৭১-এর বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় রাজাকাররা আশ্রমে হামলা করে। অন্য ভক্তদের সঙ্গে ছোটোকাঁকাও মারা যায়।’

‘উনি খুন হন!’ ‘কই তুমি, বাবা কেউ তো আমাদের বলনি!’

বিনি, অনির এক যোগে নিভাননীকে আক্রমণ।

‘তোমরা তো সব সময় দেশ সম্বন্ধে খালি ভালো ভালো কথাই বলে আসছ। এটা তোমরা ঠিক করনি। বাস্তবকে গোপন করা অন্যায্য’, অনি রাগ করে।

বিনি বোনের হাত ধরে, ‘চুপ কর। বুঝতে চেষ্টা কর। মানুষ যদি দুঃখ কষ্ট না ভোলে তাহলে বাঁচতেই পারবে না। যাই ঘটুক, জীবন থমকে থাকে না। ঠিক চলে।’

‘রাখ তো তোর গুরুগিরি। আপনজনের এমন পরিণতি ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত জানতে পারল না। আমার তো দেশ সম্পর্কে ধারণাটাই বদলে যাচ্ছে।’

‘দ্যাটস আনফেয়ার, অনিদি। পিসিমণি তো বললেন কত ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটছিল।’

‘হ্যাঁ বললেন। সেগুলো জাস্ট খবরের কাগজের খবর। অমুক

স্থানে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় এত নরনারী নিহত, এত জখম, এত অপহৃত, ধর্ষিত, এত সম্পত্তি ধ্বংস। এসব তো আমাকে টাচ করে না। কিন্তু ছোড়াদাদুর খুন হওয়া! তুই বুঝতে পারছিস না? এটা তো আমার এখানে লাগে,’ বুকে একটা থাপ্পড় মারে।

‘অনিদি হ্যাজ আ পয়েন্ট,’ মিলির সমর্থন। ‘আমাদের শেখানো হয়েছে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ ইংরেজদের ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসির ফল, আগে বরাবর হিন্দু-মুসলমান ভাইভাই ছিল। পার্টিশান ব্যাপারটাই বজ্জাতি, ইংরেজদের করা। আর পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা নাকি সব বিহার থেকে যে সব মুসলমান রিফিউজি গিয়েছিল, তাদের কীর্তি। বাঙ্গালি মুসলমানদের নয়। পিসিমণির আর মায়ের কথায় তো দেখছি সব দেশের লোকেরাই করেছে, অন্তত তারাই পালের গোদা। আমাদের পুরো ভুল বোঝানো হয়েছে। ওখানকার মাটিতেই বিদ্রোহ।’ রুমকি স্কোভ উগরে দেয়।

‘আবদুল ভাইকে ভুললে চলে না,’ বিনি মনে করায়।

‘ভুলছি না। কিন্তু আবদুল ভাই ব্যতিক্রমী এক জন, আর ওরা অসংখ্য। ইংরেজিতে একটা কথা আছে না? এক্সেপশানস প্রুভ দ্য রুল?’ শেষ কথা রুমকির, ভালো ছাত্রী তো।

মায়া চুপ করে শুনছে। ‘ছোটো মাসিমার নিজের কোনো কথা নেই, উনি তো জ্ঞান হওয়ার বয়স থেকে কলকাতায়। কী সৌভাগ্য।’

অপর্ণা নীরবে মাথা হেলায়, হ্যাঁ সৌভাগ্য। জ্ঞান হওয়ার বয়স থেকে কলকাতায়। বয়স্কদের চোখ বন্ধ। ছোটোরা মোবাইলে ব্যস্ত। মিলি সারাক্ষণ ঝুঁকে ঝুঁকে অনির মোবাইলে দৃষ্টি দিয়ে যাচ্ছে। খানিক ক্ষণ পরে জানায়, ‘তোমাদের সব কথা রেকর্ড করা হয়ে গেছে, ইন ফ্যাক্ট ভিডিও। অনিদি এডিট করে সবাইকে ফরওয়ার্ড করে দিও, প্লিজ।’

‘শিওর।’

সবাই চুপ। প্রতিভা প্রায় ঘুমিয়ে। রিল্যাক্সড, যেন একটা বিশাল ভার মাথা থেকে নেমে গেছে। নিভাননী নীরব, তাঁর গাল ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে। শুধু মাঝে মাঝে মাথা নেড়ে যাচ্ছেন, না না না। অপর্ণা মৃদু স্বরে বলেন, ‘দিদি, ওরা বুঝবে না। এমন অনেক কষ্ট আছে যা বলা যায় না। বললে আবার কষ্ট।’

নিভাননী মাথা হেলান, ‘হ্যাঁ, এই জনেই আমি দেশের কথা মনে করতে চাই না। যে টুকু করি ভালোটাই করি।’

‘আপনাদের বংশের তাহলে ভিটেতে আর কেউ নেই?’ মায়া প্রসঙ্গ বদলাতে যায়।

‘আছে। বললাম না, ঠাকুরদারা তিন ভাই ছিলেন। আমাদের পর তাঁদেরও বেশির ভাগ দেশ ছাড়েন। কেউ কেউ অসমে কেউ উত্তরবঙ্গে। আসলে যার যেখানে কুটুম্ব বন্ধু বা জানাশোনা ছিল সেখানেই প্রথমে আশ্রয় নিয়েছে। তারপর সব ছড়িয়ে গেছে। খালি সেজ ঠাকুরদার মেজোছেলে রয়ে গিয়ে ছিল। সে জমিজমা চাষবাস নিয়ে আওয়ামি লিগটিং করে টিকে আছে। বাকি সব চলে এসেছে।’

‘আমরা রাঙামামা বলি। একবার তিন মেয়েকে নিয়ে



Air Coolers, Storage Water Heaters,
Exhaust Fans, Ceilling Fans, Fresh Air Fans,
Cooler Kit, Washing Machines, Heat Convector



VIKAS ENGINEERS

Manufacturers of :
SAHARA Electrical Appliances
D-377/378, Sector-10, NOIDA-201301
Ph.:0120-2520297, 2558594
Telefax : 0120-2526961
Website : www.saharaappliancesindia.com



এসেছিলেন। মেয়েগুলো কী গাঁইয়া। বোন বলে ভাবতেই পারা যায় না। যেমন সেকলে শাড়িরাউজ, তেমনই সাজগোজের ছিরি। সব খালি ছেলেপুলে ঘরসংসার নিয়ে আছে। বড় জোর সিনেমা। আর কিছু জানে না।’ অনি যোগ করে। ‘আর বাঙ্গলায় তো মা গঙ্গা।’

‘রুমকির শিক্ষিকা সুলভ টিপ্পনি। হি-হি-হি। নিভাননী ধমক দেন, ‘জামালপুরের গ্রামে মানুষ হয়ে এর থেকে বেশি আর কী হবে। তাদের সঙ্গে তুলনা করিস কেন।’

‘তোমরা রিফিউজি হয়ে কলকাতায় না এলে আমাদেরও ওই অবস্থা হতো।’ বুঝদার বিনি পর্যন্ত এখন এদের দলে যোগ দিয়েছে।

‘বলিস না দিদি, বলিস না। দ্যাশের কথাতো ভাবলেও ভয় করে!’ অনি ব্যাগ থেকে চিরুনি বের করে চুল ঠিক করে লিপস্টিক মেরামত করতে করতে বলে।



ভয় ভয় ভয়। অপর্ণার কাছে দেশ মানে শুধু ভয়। ভাগ্যিস ওকে কেউ দেশের কথা জিজ্ঞাসা করে না। সবাই যখন চলে এলো, তখন ওর তো মোটে পাঁচ বছর বয়স ছিল, জ্ঞান হয়নি বটে কিন্তু মুখে বুলি ফুটে গিয়েছিল।

আচ্ছা, জ্ঞান হওয়ার আগে কি কিছু মনে থাকে? কেমন আবছা সব ছবি। অনেক অনেক ছবি। ঠাকুরদার কাছে বসে একদিন বলছি, ‘উঠানে ফুটফুটে জ্যোৎস্না, ঠাকমা আলপনা দিতাসে, ধানের শীষ, তার দুই পাশে লক্ষ্মীর পা। মা লক্ষ্মী পা ফেইল্যা ফেইল্যা ঘরে ঢুকব।’

‘কোথায় তুই ঠাকমার লক্ষ্মীর পা আঁকা দেখসস, হেইটা বৈশাখ মাস। গত বৎসরের কথা বলতাসস? না, তর ঠাকমা আলপনা দেয় নাই, বুড়ি তো বাতের ব্যাদনায় কোঁ কোঁ করতাসিল।’ ঠাকুরদা হেসে তাকে শুধরাতে যান।

‘গত বৎসরের আগের বৎসর চতুর্দশীর রাইত জাইগ্যা মা বাড়ি ঘর উঠান সব ভইরা আলপনা দিসিলেন। বাবা আপনে ভুইল্যা গেসেন। সকালে উইঠ্যা আমরা তাজ্জব। কী যে সুন্দর, এক্কেরে ছবি।’ মা এবার শ্বশুরমশাইকে শোধরান।

‘অ্যাতটুকু মাইয়ার মনে আছে আর আমাগো নাই! আশ্চর্য। বুঝলা বৌমা তোমার এই মাইয়াটার মগজে একটা ক্যামেরা আছে। অ্যাক্কেরে মুভি ক্যামেরা। খালি ছবি তোলে। শুধু ক্যামেরা নয়, রেকর্ডিংও চলে।’

অনেক অনেক ছবি আছে অপর্ণার অ্যালবামে। ভিডিয়ো। শীত কাল। মায়ের হাতে দুধভাত খেয়ে লেপকাঁথা মুড়ি দিয়ে আমি শুয়ে। আজ রাতে বাবা মা ফিস ফিস করে কেন কথা বলছে।

‘কাজীর চর, খাসেরহাটে হামলা হইসে, সাতানিতে নন্দীরা দুই ভাই, বেশ পয়সা করসিল, দুইজনেই খতম। ডাক্তার ব্যানার্জি, আরও এক ডাক্তার দুই জনই খুন।’

‘ডাক্তার মাইরা কী লাভ। অরাকি শুধু হিন্দুদের চিকিৎসা করতেন।’ ‘সবাই মূল্যাদী গেসিল, নালিশ করতে, থানাবাবু কইলেন, ‘সব অসুখে মরসে। যান পুড়াইবার ইন্তেজাম করেন গিয়া।’

মা চোখ মুছছে, বিড়বিড় করছে, ‘ঠাকুর রক্ষা কর, রক্ষা কর।’

তারপর একটা ভিডিয়ো। সারা সকাল ধরে চারিদিকে আওয়াজ, দুম দাম, চীৎকার, আল্লাহ্ আকবর। বেলা বাড়লে সব চূপ। আমাদের দরজা জানালা বন্ধ। আমি দু’টো পুতুল নিয়ে বসে আছি।। খেলছি না। মা বাবাকে বলে, ‘কামকাজে গেলা না?’

‘খ্যাপসো? আর কামকাইজ কিসু হইব? পরিস্থিতি খুব খারাপ। যাদের বাড়িঘর ভাঙচুর হইসে, টাকাকড়ি সোনা দানা সব লইয়া গেসে, তারা থানায় গেসিল, পরানটা বাঁচাইতে, শেল্টার লওনের লাইগ্যা। ওদের ভিতরে ঢুকইয়া ওসি গুন্ডার দলকে ডাক দিসে। সেখানেই সব কচুকাটা।’

মা কেঁদে ফেলে ‘আর কইও না, শুনুম না। ভগবান, তুমি কি নাই!’ মা খালি কাঁদে। এই ‘কচুকাটা’ কথাটার মানে কী। ওখানে কি কচু ছিল। আর কচু কাটলে কান্নার কী আছে।

খেতে বসে দেখি শুধু ভাতে ভাত। অন্যদিন মা তো কত পদ রাঁধে। ‘খামু না।’ মা চড় মারতে হাত উঠায়, বাবা হাতটা ধরে ফেলে। ঠাকুরদা বলে, ‘পোলাপান, কী বোঝে।’ ঠাকমা হাঁটুতে ব্যথা নিয়েই সারা দিন লক্ষ্মীনারায়ণের সামনে বসে কী যে কান্না কাঁদছে। ভারি বিরক্ত লাগে। মাঝ রাতে ঘুম ভাঙে। শুনি বাবা মা ফিসফিস করে সমানে বলে চলেছে, কোথায় হামলা হলো, কত দোকান ভাঙচুর, কে কে মরল, কত বাড়ি জ্বলল।

আবার ছবি, ভিডিয়ো। সকালে খেতে বসেছি, বাটিতে খালি দু’টো মুড়ি। গোয়ালা আসেনি, দুধ নেই। বেশ রোদ উঠেছে। এমন সময় শোনা গেল বাইরে হাঁক দিয়ে যাচ্ছে, ‘সব হিন্দু আর খ্রিস্টানরা মূল্যাদী বন্দরে পাঁচ তহবিল, মাধব লাল কুণ্ডু, সুখময় কুণ্ডুর গুদাম ঘরগুলোয় চইল্যা আসেন। আপনাগো লাইগ্যা রিলিফ ক্যাম্প খুলা হইসে। টাকা কড়ি সোনাদানা সব লইয়া আসেন। বাড়িতে কিসু ফেলাইয়া গেলে আমরা দায়িত্ব নিমু না। আসেন হক্কেলে বাইর হইয়া আসেন, বুড়াবুড়ি পোলামাইয়া হক্কেলে লইয়া সোজা মূল্যাদী বন্দর গুদামগুলোয় চইলা আসেন।’

তারপরের ছবি। রাস্তায় কী ভিড় কী ভিড়। তার মধ্যে আমি বাবার কোলে, বাবা অন্য হাতে ঠাকুমাকে অর্ধেক জড়িয়ে ধরে হাঁটাচ্ছে, মা পাশে হাঁটাচ্ছে, তার এক হাত ঠাকুরদার ওপর হাতে শক্ত করে ধরা।

ঠাকুরদা বিড়বিড় করে বলে, ‘যাইতাসি পরানটা হাতে লইয়া। এ গুলারে বিশ্বাস নাই।’

মা অন্য হাত বাবার গায়ে রাখে, ‘শুনতাস, আমার বড় ডর লাগতাসে। চল, বাড়ি ফির্যা যাই। কপালে যা আছে নিজের

জায়গায় হইব।’ বাবা চাপা গলায় বলে, ‘আমাগো হিন্দুদের অ্যাঁই দ্যাশে নিজের জায়গা নাই। দাদা ঠিক কইসিল, তাই আগেই ভারত অপশান দিয়া দ্যাশ ছাড়সে। আমরা শুনি নাই। ভুল করসি। অ্যাঁখুন সরকারি জুকুম মানা ছাড়া উপায় নাই। যাইতেই হইব। চল, আমরা তো একসঙ্গে আসি।’ আমার কানে কানে বলে, ‘তুই ডরাইবি না, কেমন? সূনা মা আমার, একদম ডরাইবি না।’ ‘না। ডরাইমু না।’ বাবার কাঁধে মাথা রাখি।’

তারপর কোন ছবি? একটা মস্ত ঘেরা ঢাকা জায়গা, ঘরের মতো তবে অনেক অনেক বড়। কাঠের সব তাকে মস্ত মস্ত বস্তা রাখা। একটার পর একটা আবার সেগুলোর ওপরে আরও বস্তা। চারিদিকে আরও কত কী রাখা, ভেজা গন্ধ, বুড়িতে চটচাপা সব কী। ঢুকতে ঢুকতে ভিড়ের মধ্যে বাবা হঠাৎ ঝট করে আমাকে একটা তাকের ওপর বস্তার সারির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ফিস ফিস করে বলল, ‘চুপচাপ লুকাইয়া বইস্যা থাক, রা কাড়বি না, নট নড়নচড়ন, ক্যামন। আমি আইস্যা তরে লইয়া যামু। লক্ষ্মী মা আমার।’ হাঁ, আমি মাথা হেলাই। বস্তার ফাঁক দিয়ে দেখতে থাকি। ওই যে মাঝখানে খোলা জায়গায় সবাই জড়ো হচ্ছে। কতগুলো পুলিশ এসে ঠাকুরদা-ঠাকুমার মতো সব বুড়োবুড়িদের জোর করে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে আলাদা করে একটা কোণে নিয়ে গেল। বাচ্চাদেরও। সবাই চ্যাচামেচি কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। বাবা মা কোথায়। ওই যে। তাদের সব সামনে সারি দিয়ে ইস্কুলের মতো দাঁড় করানো হলো। একটা পুলিশ হুইস্‌ল দিল। অমনি শোনা গেল ‘আল্লা হু আকবর’। গুদামের দরজা দিয়ে ছড়ছড় করে সব লুঙ্গি পরা লোক দৌড়ে ঢুকে এলো। হাতে সব কী রুপোর মতো চকচক করছে। হ্যাঁ, কত তলোয়ার, বড় বড় ছুরি। সোজা বাবাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তলোয়ার ছুরির রূপালি ঝলক। ঝকঝক ঝকঝক। সবাই কী রকম দু’খানা তিনখানা চারখানা হয়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছে। ঝকঝক ঝকঝক ঝকঝক। না, এখন সব তলোয়ার ছুরি লালে লাল। টপটপ করে লাল পড়ছে। ওইযে ঠাকুরদা লাঠি নিয়ে তেড়ে যাচ্ছে, আরো দু’তিন জন বুড়া যাচ্ছে। ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ। ঝকঝক তরোয়াল চলল, একে একে প্রত্যেক ঠাকুরদা তিন চার খানা হয়ে গেল।

মা, অন্য মাসি-পিসিরা সবাই চীৎকার করে ছুটে বাবাদের কাছে যাচ্ছে। অমনি সেই ছুরি তলোয়ার হাতে লোকগুলো বাঁ-হাতে মায়েদের চুলের মুঠি বা শাড়ির আঁচল ধরে টেনে হিঁচড়ে আর একটা পুলিশের সামনে দাঁড় করচ্ছে। এটা বড় পুলিশ। লোকটা কাছে এগিয়ে এসে মায়ের হাতের শাঁখা দুটো ভাঙছে। কে যেন একটা গামছা এগিয়ে দিয়েছে। সেটা দিয়ে মায়ের কপালে সিঁদুরের টিপ, সিঁথির সিঁদুর সব ঘস ঘস করে মুছেছে, মুছেছে। তারপর একটা ছোটো বন্দুক কোমর থেকে বের করে মায়ের মাথায় ঠেকিয়ে বলছে, ‘বল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।’

মায়ের চোখ বন্ধ ঠোট দুটো থরথর করে কাঁপছে, শাড়ির আঁচল মাটিতে লুটছে, খোঁপা খুলে গেছে চুল এলো। মা কি কিছু

বলছে? কে জানে।

লোকটা এবারে চীৎকার করে, ‘আমরা মুলাদী ফতে করসি। আখুন গনিমতের মাল বাইট্যা দিনু। মহম্মাদ্যা, আয়।’

তরোয়াল হাতে একটা বিশাল রাক্ষস সামনে এল, তরোয়াল থেকে টপটপ করে লাল পড়তে পড়তে আসছে।

‘এই নে, এটা তর গনিমতের মাল।’

রাক্ষসটা সেলাম ঠুকে মাকে টেনে হেঁচড়ে এক কোণে নিয়ে মেঝেতে ঠাস করে ফেলে দিল। মায়ের মাথায় নিশ্চয় লেগেছে। মা, ওমা, মা রে-এ-এ। মা যে পড়ে আছে। রাক্ষসটা লুঙ্গি তুলে মায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অইতো মা হাত ছুঁড়ছে, চীৎকার করছে পা ছুড়ছে। রাক্ষসটা মায়ের মাথাটা তুলে ঠাস ঠাস করে মেঝেতে মারছে। মায়ের মাথাটা এক দিকে হেলে পড়ে রইল। মা, ওমা, মা-আ-আ-আ। কোনো সাড়া নেই।

এদিকে এক-এক করে অন্য মায়েদের বড় পুলিশ সামনে আনছে, শাঁখা ভাঙছে, সিঁদুর মুছেছে। লা ইলাহা বলছে তারপর একটা নাম ডাকছে, আর একটা রাক্ষস তাকে টেনে নিয়ে মাটিতে ফেলেছে আর তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কী চীৎকার হাতপা ছোড়া, কান্না। গালাগালি চড়াপড় দুমদাম মার। কয়েকটা রাক্ষস তরোয়াল লম্বা করে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে সব ছেলে-মেয়ে বুড়া-বুড়িকে এক ধারে আটকে রেখেছে। বাচ্চারা গলা ছেড়ে কাঁদছে, বুড়ো-বুড়িরা হাত দিয়ে চোখ ঢেকে রেখে চীৎকার করছে, ‘হে মধুসূদন, রক্ষা করো রক্ষা করো।’

আমি খালি বাবাকে খুঁজছি। তরোয়াল দিয়ে যে কী করল বাবাকে। আমার কেমন ভেতরটা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। চোখের সামনে অন্ধকার। সব অন্ধকার। তারপর কিছু মনে নেই। আমি যেন ঘুমিয়ে পড়ি।

চোখ মেলেছি। সামনে তাকাই। কই তরোয়াল ছুরির ঝকঝকানি কই, রাক্ষসগুলোই-বা কই। কিছুই নেই। ও, আবার খারাপ স্বপ্ন দেখছিলাম। আমি তো প্রায় দেখি। এফুনি মা আমার মাথা তুলে ধরে জল খাওয়াবে, বাবা বলবে, ‘অপু সোনা এইতো আমি আছি, কীসের স্বপ্ন, কোনো ডর নাই।’ চারিদিকে তাকাই। অনেক লোক, এরা অন্য, সব শার্টপ্যান্ট পরা। বুড়োবুড়িরা তাদের সামনে, কয়েকটা বাচ্চা ছেলে-মেয়েও। কিন্তু বাবা তো এলো না আমাকে নিতে। ‘বাবা, বাবা।’ কখন গলা দিয়ে আওয়াজ বেরিয়ে যায়। সবাই চারদিকে তাকায়। আরে ওইযে ঠাকমা।

‘ঠাকমা-আ-আ-আ।’ এবারে সবাই ঠিক আমাকে দেখতে পায়।

‘অপু অপু’, ওই হাঁটু নিয়েই খোঁড়াতে খোঁড়াতে প্রায় ছুটে আসছে। পিছনে দু’জন শার্টপ্যান্ট পরা লোক। আমাকে ওরা কোলে করে নামায়, ঠাকুমা কাঁদতে কাঁদতে আমাকে জড়িয়ে ধরে।

‘আপনার নাতনি? বালো বালো, এখন আসেন আসেন, অনেক কাম আসে, ঘটনা কী, স্বামী ছেলে সকলের নাম ধাম লাগব—’

পরের ছবি। একটা ঘর, সামনে টেবিলে একটা শার্ট-প্যান্ট পরা বয়স্ক লোক। লম্বা খাতার মতো কী খুলে বসে আছে। সামনে আমাকে কোলে নিয়ে বসে ঠাকমা সমানে কাঁদছে। পিছনে অনেক



বুড়োবুড়ি, সকলে কাঁদছে, কেউ কেউ বুক চাপড়াচ্ছে, কারও কারও কোলে আমার মতো বাচ্চা।

‘অ্যাঙ্কু চুপ করেন, শান্ত হন। কাম করতে দ্যান। স্বামীর নাম তো বলবেন না, তা ছেলেদের নাম বলেন।’

‘ঠাকুমা জ্যাঠামশাইয়ের নাম বলতেই শার্ট-প্যান্ট পরা বলে ওঠেন, ‘সুদীপ ঘোষ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট? আমি তো স্যারের আভারে কাম করসি। পার্টিশানের পর ইন্ডিয়া অপ্ট করসেন। আপনারা তাঁর ফেমিলি? দেখেন দিকি কী কাণ্ড। সি সি সি। বড়ই দুঃখের কথা। কী করবেন। দিনকাল এমন হইসে সরকারের হাতে আর কন্ট্রোল নাই।’

‘ক্যান সরকারই তো নাটের গুরু। ওই মুলাদী থানার সব কটা পুলিশ, বড়বাবু জোট কইরা তো গুন্ডাদের আনসে, খুন জখম, কুকাঁজ সব করসে। আমি নিজের চক্ষে দ্যাখসি আমার পোলাটারে,

তার বাপ রে—’

‘থাক থাক। যা হইবার তো হইয়া গেসে। সরকার দ্যাখতাসে। এখন আপনি বলেন সুদীপ স্যার কোথায় পোস্টেড, জায়গার নাম জানেন? ব্যস্, আর চিন্তা নাই।’

‘এই মাইয়াটার যে বাপ-মা, ঠাকুরদা গেল, আমার যে স্বামী ছেলে সব গেল, তাদের মুখে আগুন পর্যন্ত পড়ল না, তার বিচার—’

‘যা ঘটসে সে ঘটনা তো আর ফিরাইতে পারুম না। এখন আপনাগো সেফটির বন্দোবস্ত করি।’

‘কিন্তু আমার বউমা? তারে উদ্ধার করবেন না?’ ‘খোঁজ পাওনই মুশকিল।’

‘ক্যান মুশকিল হইব। আপনাগো থানাবাবু নিজে তারে গুন্ডার হাতে তুইল্যা দিল, আমি স্বচক্ষে দ্যাখসি।’

‘সে হয়তো ঘরে লইয়া গেসে গিয়া। হেইটা হইলে তো মন্দের ভাল। নইলে যদি বেইচ্যা দায়---’

‘না না না। বলবেন না বলবেন না। বউমা আমার ঘরের লক্ষ্মী। তারে এমন শাস্তি—

—দেখেন যদিই-বা খোঁজ পাওয়া যায়, উদ্ধার কইরা কী হইব। আপনারা হিন্দু হইকাস্ট। যে বউরে মুসলমান নষ্ট করসে, তারে তো আর ঘরে লইবেন না।’

ঠাকুমার মুখ পাথর, ‘শোনেন, গুয়ে পড়লেও শালগ্রাম শিলা অপবিত্র হয় না। জলে ধুইলেই শুদ্ধ।’

ছবি। নদীয়া সদর। ফিটফাট পোশাক পরা এসডিও সাহেবের মেয়ে স্কুলে যায়। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে খেলা করে। বাড়িতে দুই দাদার সঙ্গে ভাব, খুনসুটি। কে এই মেয়ে? আমি অপর্ণা।

না, মায়ের খোঁজ পাওয়া যায়নি। সেই ভদ্রলোকটি জ্যাঠামশাইয়ের আন্ডারে যিনি কাজ করেছিলেন, আমাদের ভারতের বর্ডারে পৌছে দেওয়ার বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন বোধহয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ দেশ ছেড়ে ভারতে যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে আমরাও ঠিক কী করে পৌছলাম সে সব কিছুই মনে নেই। সব অন্ধকার।

শুধু আবছা একটাই ছবি, প্রথম জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে দেখা। বরবর করে কাঁদতে কাঁদতে ঠাকুমা তাঁর হাত ধরে বলছে, ‘ওরে অনাথ মাইয়াটারে অ্যাঁকু দেখিস।’ জ্যাঠামশাই বলছেন, ‘মা, আমি থাকতে অপু অনাথ কেন হবে? আজ থেকে আমি ওর বাবা,’ জ্যাঠাইমাকে দেখিয়ে বললেন, ‘কল্যাণী ওর মা।’

ঠাকুমা তো অল্পদিন পরেই গত হলেন। যে ক’দিন বেঁচেছিলেন, খালি চোখের জল ফেলতেন আর একটাই কথা বার বার আউড়ে যেতেন, ‘ঠাকুর, ঠাকুর, আমার লক্ষ্মী বউমার লগে তুমি ক্যান অ্যামুন অন্যায় করলা, আমি আর তোমারে পূজা করুম না, না না।’

করেনওনি। মৃত্যুশয্যায়ও ঠাকুরের নাম নেননি। জ্যাঠামশাই-জেঠিমা দু’জনেই কথা রাখলেন। বাবা-মায়ের অভাব বুঝতে দেননি। স্কুলে কলেজে ভরতির সময় বাবার নামের কলামে ওঁর নাম থাকল। জেঠিমাকে প্রথম প্রথম মা বলতে পারতাম না। একদিন অন্ধকারে পড়ে গিয়ে খুব চোট লাগল, চোঁচিয়ে উঠেছি, ‘মা, মা।’ জেঠিমা দৌড়ে এসে আমাকে কোলে তুলে নিলেন, ‘এইতো আমি, অপু সোনা।’ দাদারা দু’জন একেবারে নিজের হয়ে গেল। তবে আমার বি.এ. পাশের আগেই হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে চলে গেলেন জ্যাঠামশাই যাকে আমি বাবা ডাকতাম।

তাড়াছড়ো করে বিয়ে হলো। ব্যবসায়ী পরিবারে, দাদাদের একটু কিস্তিকিস্ত ছিল। যাই হোক, কোনো অসুবিধা হয়নি। ছেলে-মেয়ে পড়াশোনা করেছে, দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু মূল্যদীর বাবা মা? তারা কোথায় হারিয়ে গেল চিরদিনের মতো? ঘুমের মধ্যে দেখি বাবার কোলে আমি তাঁর কাঁধে মাথা দিয়ে আছি, তুই ডরাইবি না, সুনামা আমার। জাগা অবস্থায় অন্যমনস্ক হলে যেন এখনো মায়ের হাতের ছোঁয়া পাই, আমার চুল কে আঁচড়ায়।

‘মাসিমাদের দিব্যি একটা ঘুম হয়ে গেল, তাই না? মায়ার কথায় অপর্ণা যেন ঘোরের মধ্যে থেকে জেগে ওঠেন।’

‘তুই বেশ আছিস, তোর কোনো কেস নেই।’ অনি মায়ার পিছনে লাগে।

‘কেস মানে?’

‘মানে এই যে মা-মাইমাদের মতো ওপারে আগেকার কষ্টের কথা।’

মিলি বলে, ‘ওর আবার কেস কী করে হবে। পিসিমণি, মা, এরা সব আদতে সেই ’৪৭ সালে পার্টিশানের পরের দশ-পনেরো বছরের হাঙ্গামার ভুক্তভোগী। তখন তো পাকিস্তান ছিল। তার পর কত লড়াই করে বাংলাদেশ হলো। আর সমস্যা নেই।’

‘কী করে জানলেন সমস্যা নেই? আমার কেস জানেন?’

‘সে কী রে। তুই তো একেবারে আমাদের বাংলা বলিস! তোর আবার ওপারে দেশ হলো কী করে?’ অনি বিনি দুজনেই তাজ্জব।

‘আরে ভাষা শিখতে ক’দিন লাগে। আমি তো এ দেশের মাটিতে পা দিয়ে প্রথমই বাংলাটা শিখেছি। ওপারের কোনো কিছু আমি মনে রাখতে চাই না। সবচেয়ে আগে ওই বরিশাইল্যা চঙ্গের বুলি।’

‘বাপ রে নিজের দেশের ওপরে তোর এত রাগ কেন? এখন তো পাকিস্তান নেই, বাংলাদেশই নাকি বাঙ্গালিদের আসল জায়গা।’

‘হুঁ! ভারি আমার বাঙ্গালিরে! কার আসল জায়গা? বাংলাদেশকে আমি লাথি মারি। থুতু দিই। কেন? ওদেশে ‘ভোলা’ নামে একটা দ্বীপ আছে, মস্ত দ্বীপ, জানেন?’

‘ভোলা? কই না তো! কী অদ্ভুত নাম। জায়গার নাম ভোলা! ‘বরিশাল জেলায়। মেঘনা নদীর মুখে। মস্ত দ্বীপ। ভোলাতে কী ঘটেছিল জানেন বছর বিশেক আগে? না, আপনারা পশ্চিমবঙ্গে তো বাংলাদেশের আসল কোনো খবরই রাখেন না। খালি গঙ্গাপদ্মা বাওয়াল করেন! আওয়ামি লিগ বিএনপি-জামাতিকে নির্বাচনে হারাল, মনে আছে? ব্যস্! অমনি হিন্দুদের কপাল পুড়ল। সঙ্গে সঙ্গে মারকাট, লুটপাট, হামলা, রেপ। হিন্দুরা সব নাকি আওয়ামিদের ভোট দিয়েছে। ভোলার চর ফ্যাসন আর লালমোহন উপজিলায় হাজার হাজার মুসলমান কয়েকশো হিন্দু মেয়েলোককে ধর্ষণ করল। আমাদের গ্রাম ছিল লালমোহনে। কোনো স্বীজাতীয় বাদ পড়েনি, আট থেকে আশি। আমার বয়স তখন নয়, মায়ের তিরিশ। কত জন মাকে আর আমাকে ধর্ষণ করল হিসেব নেই। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। জ্ঞান ফিরলে দেখি আমি রক্তে ভেসে যাচ্ছি, মা রক্তে মাখামাখি হয়ে পড়ে আছে।

‘মায়া, তুই রেপ সার্ভাইভার!’ বিনি স্তম্ভিত।

‘কী সাঙ্ঘাতিক! এগুলো কি মানুষ?’ একযোগে রুমকি অনি।

‘হাসপাতালে সকলের সময়মতো চিকিৎসা হলো তো?’

মিলির তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন।

‘বাংলাদেশের হাসপাতাল, তাও আবার হিন্দু মেয়ে গণধর্ষণ

কেসের চিকিৎসা! ২০০১ সালে ভোলা দ্বীপে! আপনারা ভাবেন কী? সকলের প্রথম কাজ হলো চেপে যাওয়া, ধর্ষণ তো মেয়েদের দোষ। চিকিৎসার কোনো প্রশ্নই নেই। ওই গাঁয়ের হাতুড়ে, দইটাইরা টোটকা মোটকা দিয়ে ব্রিডিং বন্ধ করে। আর খারাপ রোগটোগের ইনফেকশান হলো তো কপাল মন্দ। আমার মা-টা যেমন, সেই কাণ্ডের পর কী সব রোগ হলো, দু'মাসের মধ্যেই খতম। খুব কষ্ট পেয়েছিল।’

‘কী ভয়ংকর। আর পুলিশ কী করল?’

‘ভোলা দ্বীপের গ্রামে পুলিশ ডাকবে হিন্দু মেয়ের ধর্ষণে! খেপেছেন। কার ঘাড়ে কটা মাথা?’



‘বাংলাদেশে হিন্দুদের অবস্থা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জার্মানিতে ইহুদিদের চেয়েও খারাপ। এতো নাৎসিদের হার মানায়।

আচ্ছা, বাঙ্গালি রিফিউজিদের নিয়ে ‘নতুন ইহুদি’ নামে একটা সিনেমা হয়েছিল না?’

রুমকির আঁতেল মার্কা প্রতিক্রিয়া। ‘রাখ তোর সিনেমা। ও দেশে হিন্দু মরছে, রেপ হচ্ছে, আর পশ্চিমবঙ্গে বাঙ্গালি সিনেমা বানাচ্ছে। যত সব!

মায়া, তোমাদের জন্য সরকার কিছুই করল না? আওয়ামী লিগ তো ক্ষমতায় এলো।’ অনির বাস্তববাদী প্রশ্ন।

‘ওই সব কি মানবতাবাদীরা এসে টেঁচামেচি করার পরই তো লোক জানাজানি, হইচই হয়েছিল। কী কমিশন টন বসল। হ্যাঁ, প্রমাণ হলো বিএনপি-জামাত মিলে গণধর্ষণ কাণ্ড করেছিল, অনেক এমপি টেমপিও ছিল। হিন্দুদের মতো মুসলমান সমাজ নয়, ভদ্রলোক-ছোটলোক, উঁচু জাত-নীচু জাতফাত নেই। সকলে মসজিদে পাশাপাশি নামাজ পড়ে, এক সঙ্গে খায়, এক সঙ্গে ধর্ষণ করে। এমপি আর গুন্ডায় কোনো তফাত নেই, ভারি সাম্যবাদী।’

অনি মিলি রুমকি একসঙ্গে সবিস্ময়ে মাথা নাড়ে, ‘ভাবা যায় না।’

‘এরা নাকি আবার আমাদের সঙ্গে এক, বাঙ্গালি। মিথ্যার আর শেষ নেই।’ বিনির মন্তব্য।

‘তুমি এখানে এলে কী করে?’ অপর্ণা জানতে চান।

‘মা মরল, বাপটা এই কাণ্ডের পরে যেন থেকেও নেই, তারপর বিবাগী হয়ে গেল, ছোটো ভাই-বোনগুলো সব আমার ঘাড়ে। ধুতেরি ছাই, বলে আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলাম। তখন আমার বয়স এই বারো-তেরো হবে।’

‘সে কী! অতটুকু মেয়ে, কোথায়, কেমন করে, কার সঙ্গে বেরিয়ে গেলে?’ প্রতিভা অবাক! ‘অতটুকু কী বলছেন মাসিমা? আমি তো ন’ বছরেই সাবালিকা হয়ে গিয়েছিলাম। যাই হোক,

সেসব ভালো-মন্দ অনেক কথা। মোটামুট যারা লুকিয়েচুরিয়ে বর্ডার পেরয়, মেয়েটেয়ে পাচার করে, আমি তাদের সঙ্গে জুটে গেলাম। তাদের সঙ্গেই এ দেশের মাটিতে পা রাখলাম। রেখেই দল থেকে পালালাম, আমি তো আর গেরস্ত ঘরের গায়ে হাত না লাগা ভীতুর ডিম ন্যাকাবোকা মেয়ে নই। আমার শুধু নিজের পেটের চিন্তা। এ মাটিতে পা দিয়েই আমি কাজ খুঁজলাম। লোকের বাড়িতে বাসন মাজা, ঘর মোছার কাজ পেলাম। শরীরে খুব কষ্ট ছিল। ওই বাড়ির গিন্নির কথায় মেয়ে ডাক্তার দেখালাম, তাঁকেই প্রথম সব কথা বললাম। উনি খুব ভালো চিকিৎসা করলেন, টাকা নেননি, সেরে গেলাম। তবে বলে দিলেন, আমার নাড়ি জখম হয়ে গেছে, আমি কোনোদিন মা হতে পারব না। বয়েই গেল, পুরুষ মানুষের বিছানা, সংসার ভাবলেই বমি আসে। ঈশ্বর রক্ষা করেছেন। ব্যস, ঝাড়া হাতপা। রোগীর কাজ শিখলাম। রোজগার বাড়ল।’

‘তা এদেশে এখন তুমি খুশি তো?’ অপর্ণা জিগ্যেস করেন।

‘খুশি অখুশি জানি না। তবে এখানে মুক্ত। কাজ করি, খাইদাই, ভোলার নাম কেউ এখানে জানে না। আজ প্রথম নাম করলাম।’

‘ভোলারে ভুইল্যা যাও।’ হঠাৎ নিভাননী দ্যাশের ভাষায় ইতি টানেন।

ইশ্ দেখেছ, বেলা পড়ে গেছে। আরে এফুণি অন্ধকার হয়ে যাবে যে। শীতের বেলা। চল চল, একটু ঘুরে নিই।’ ‘চা? চা খাওয়া হবে না?’

‘না না। বেড়িয়ে এসে ফ্রেশ হয়ে চা খেয়ে একদম রওনা দেব। দুপুরে যা হেভি খাওয়া হয়েছে।’

‘বিকলে সব রেসটের মতো এখানেও চায়ের সঙ্গে চিকেন পাকোড়া দিলে খাওয়া যাবে?’

‘বলিস না, ভাবলেও গা কেমন করছে।’

আড়মোড়া ভেঙে একে একে সবাই উঠে বসে। শাড়ি ঠিক করে কার্ডিগান শাল জড়িয়ে দাঁড়ায়।

‘দিদি ইখানে দেখবেন আসুন’ দূরে যেন উঁচু ঢালের মতো জমি আর তার মাথায় দাঁড়িয়ে ছোটু ডাকছে।

ছোটো মিলি অনি বিনি রুমকি। ঢালের মাথায় পৌছে সমস্বরে সহর্ষ চীৎকার। ‘দেখবে এসো, দেখবে এসো।’ যথাসাধ্য জোরে পা চালিয়ে যান নিভাননী, প্রতিভা, অপর্ণা এবং পিছন পিছন মায়া। ঢালের ওপরে সাবধানে ওঠেন, এমন কিছু উঁচু নয়, তবুও। তলা দিয়ে কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে একটি নদী। পড়ন্ত সূর্যের আলোয় তার তরঙ্গের ঝিকমিকি।

‘বাঃ কী অপূর্ব!’ ‘দারুণ।’ ‘এদের এরিয়ার মধ্যে একটা আস্ত নদী কী করে এল।’

‘এটা খাল নয় তো।’

‘যাঃ খালে এমন পরিষ্কার জল, এমন ঢেউ খেলে নাকি। দিবি স্রোত আছে।’

‘কোথায় যাচ্ছে রে নদীটা, কোথাও গিয়ে নিশ্চয়ই পড়ছে, কোনো বড় নদীতে।’

‘ইখানে এরকম অনেক নদী আছে। স-ব গঙ্গামাঙ্গিয়ার থেকে এসেছে, এক সাথ মিলছে, সমুন্দরে।’

‘ও হ্যাঁ তাই তো, আমরা তো কলকাতা থেকে কত নীচের দিকে এসেছি। ম্যাপটা মনে করো। গঙ্গা শতধা হয়ে সাগরে পড়েছে।’ বিনি অনি মিলি রুমকির আলোচনা।

নদীর পাড় ধরে ঘোরাঘুরি করে। নদী না খাল না খাঁড়ি সেই নিয়ে তর্ক করতে করতে মধ্যমার আগমন।

‘মাসিমারা দিদিরা, চলুন চা খেয়ে নেবেন। এফুনি অন্ধকার হয়ে যাবে।’

‘আবার সেই মেঠো বাংলোর লম্বা বারান্দা। একটা টেবিলে সার দিয়ে রাখা ক’টা বয়মে বিস্কুট দু’তিন রকমের, চিড়ে ভাজা, মুড়ি, কৌটোয় বাদাম ছোলা, যে যা ইচ্ছে নেবে। চা। অভিনব আয়োজন। গ্রামের ছোঁওয়া। সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। যাক চিকেন পাকোড়া থেকে রেহাই। সানন্দ চা পান চলে। ‘মাসিমারা, দিদিরা কিছু আনাজ নিতে চেয়েছিলেন। দেখুন।’

বড় একটা ঝাড়িতে ফুলকপি, বাঁধাকপি, ব্রোকলি, সিম, ওলকপি, যে যা অর্ডার করেছিল। এখানেই ভাগ করে ফেলা হলো। গাড়ি থেকে নামাবার সময় আর এনার্জি থাকবে না। পেমেন্ট করে ঘরে ফ্রেশ হতে গিয়ে অনি বিনি মিলি সবাই আলোচনা করে, মোটেই কলকাতার বাজার দরের চেয়ে সস্তা নয়। যাই হোক একেবারে টাটকা, মাঠ থেকে তোলা। ঘর থেকে বেরিয়ে দেখে কী অন্ধকার, এর মধ্যে বুপ করে রাত হয়ে গেছে। বিদায় পর্ব সেরে সকলের হাতে কিছু কিছু বখশিস দিয়ে গাড়িতে ওঠে।



ফেরার পথে কারও মুখে কথা নেই। শুধু মিলি যথারীতি সামনের আসনে বসে, জিপিএস খুলে। ‘ছোট্ট সাবধানে চালা, ছোট্ট টার্ন আছে বাঁদিকে,’ করে যায়। এখন দু’দিকে কিছু দেখার নেই। শুধু অন্ধকার। মাঝে মাঝে লোকালয়। সেই ছোট ছোট বুপড়ি দোকান, কটকটে সাদা, বড়ো বড়ো আলোর বাস্ব বুলছে। সাজানো সব সস্তার পণ্যের পশরা। কোথাও চায়ের দোকান কোথাও-বা শিঙাড়া কচুরি বা বেগুনি আলুর চপ হচ্ছে। ভাজাভুজির গন্ধ। হঠাৎ এক একটা পাকা বাড়িতে কলকাতার কোনো নামি ব্র্যান্ডের গয়নার বা খাবার দোকানের সাইনবোর্ড। প্রচুর লোকজন। মেয়েরাও। ছেলেপুলে সঙ্গে নিয়ে বা একা, সব দিব্যি কলকল করে এক সঙ্গে হাঁটছে, দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে শিঙাড়া বা আলুর চপ আর চা খাচ্ছে বা জিনিসপত্র কিনছে। তারস্বরে কোথাও মাইকে গান বাজছে, ‘বন্ধু রে-এ-এ,’ পাশের গলি থেকে। কী যেন ফাংশান চলছে। সব অপরিবর্তিত, শ্রীহীন বিকাশ। কিন্তু কী জীবন্ত, কী প্রাণচঞ্চল। এখানে কোনো ভয় নেই। অপর্ণা, প্রতিভা, নিভাননী নিশ্চিত। নিশ্চিত মায়াও।

বিনি আর অনিকে বাড়িতে নামাবার সময় মিলির মন্তব্য, ‘কী দারুণ কাটল বলোতো বাঙ্গলার গ্রামে একটি দিন।’

‘শুধু দারুণ নয়, চিরস্মরণীয়,’ শেষ কথা বলে অনি।

S.T. No. 55615216 Dt. 4-9-68

Ph. :-0161- 2510766, 2512138, 2510572

C. S. T. No. 55615216 Dt. 10-9-68

Fax No. 0161-2510968/ 2609668,
Gram : TYRES

HINDUSTAN TYRE CO.

Prop. : HINDUSTAN CYCLES & TUBES (P) LIMITED

Regd. Office :

G-3, TEXTILE COLONY
INDUSTRIAL AREA - A,
LUDHIANA - 141 003

Works :

KANGANWAL
G. T. ROAD
LUDHIANA - 141 120